বাংলা টাইপোগ্রাফিক গ্রন্থ-প্রচ্ছদ : চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ভদ্রেশু রীটা*

সারসংক্ষেপ : প্রচ্ছদ রচনা দৃশ্যায়িত হয় আলংকারিক ধারার সমন্বয়ে। এই অলংকারের নিহিতার্থ অনুধাবনের উপায় হিসেবে প্রচ্ছদে চিত্রিত বহুবিধ চিহ্নরূপী উপাদান, যেমন— কাগজ, রং, রেখা, টেক্সচার, অক্ষর — ইত্যাদির বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচ্য। এক্ষেত্রে বিশ শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর তত্ত্বকাঠামো 'চিহ্নবিজ্ঞান' (semiotics)-এর তাৎপর্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই জ্ঞান শাখার মূল উদ্দেশ্যই হলো জাগতিক বিশ্বের সব কিছুকে বিশিষ্ট চিহ্নতন্ত্রে (sign-system) অন্তর্ভুক্ত করা। কাজেই প্রচ্ছদের দৃশ্যগত ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও চিহ্নবিজ্ঞান অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। বর্তমান আলোচনায় মূলত টাইপোগ্রাফিক চিহ্নবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের নির্বাচিত কিছু টাইপোগ্রাফিক প্রচ্ছদের দৃশ্যগত বক্তব্যে এই তত্ত্বের প্রয়োগ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা

বইয়ের প্রচ্ছদ দৃশ্যগত যোগাযোগের (visual communication) অন্যতম অঙ্গ হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মাধ্যম। এর নান্দনিক উপস্থিতি যেমন পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিরউদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে গ্রন্থ-চেতনা সৃষ্টি করে, তেমনি বই বিপননের মাধ্যমে প্রকাশনা শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। প্রযুক্তিগত আধুনিকায়নের প্রভাবে প্রচ্ছদশিল্প ক্রমে বিস্তার লাভ করছে। প্রচ্ছদপটের দীর্ঘ বিবর্তনের শুরুতে প্রচ্ছদ ছিল একান্তভাবে সংরক্ষণকেন্দ্রিক। চিহ্নিতকরণ এবং জীর্ণতার হাত থেকে মূল পান্ডুলিপি বা মুদ্রিত পাঠকে সংরক্ষণের জন্য একপ্রকার আবরণ ব্যবহার করাই ছিল প্রচ্ছদের মূল কাজ। পরবর্তীকালে কত বেশি বিচিত্ররূপে প্রচ্ছদকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা যায় — এমন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট ধাঁচে (format) প্রচ্ছদ নির্মাণের ধারা প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে প্রচ্ছদ শুধু পণ্যের দৃশ্যগত মাধ্যম হিসেবে প্রকাশক এবং পাঠককুলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কাজেই নয় বরং পাঠকের মনে প্রচ্ছদের নিজস্ব গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আগ্রহ তৈরির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ক্রিয়াশীল।

প্রচ্ছদ একটি বইয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুর ধারণা দেয়, সে কারণে আগ্রহী পাঠক অনেক ক্ষেত্রেই প্রচ্ছদে উপস্থাপিত শিরোনাম ও সংশ্লিষ্ট ডিজাইনের অন্তর্নিহিত ভাষা

* সহকারী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বোঝার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিল্পী যেহেতু বইয়ের মূল বক্তব্যের নির্যাসটুকু আপন কল্পনার বিমূর্ত ভাবরসে সিক্ত করে ব্যক্ত করেন রং, রেখা, টেক্সচারের বুনটে, ফলে প্রত্যেক নতুন পাঠকের কাছে একই বইয়ের প্রচ্ছদ অনুভূত হয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে। পাঠকের কাছে একটি প্রচ্ছদের ভূমিকা প্রতীয়মান হয় দুইভাবে। যেমন— ১) একটি প্রচ্ছদের গঠন প্রক্রিয়ায় একজন পাঠক শিরোনামের অর্থ অনুধাবনের পাশাপাশি প্রচ্ছদশিল্পী, প্রকাশনা ও মুদ্রণের কলা-কৌশলের দৃশ্যমান ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের নেপথ্য উপস্থিতির প্রভাবও অনুধাবন করতে পারেন। এক্ষেত্রে পাঠকের সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত যেমন, সামাজিক-অর্থনৈতিক-নান্দনিক ও সাহিত্যিক গুণাবলি বিশেষ ভূমিকা রাখে। ২) যেহেতু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন পাঠের সমন্বয় ঘটে, সে কারণে একটি বইয়ের প্রচ্ছদ সময়ভেদে প্রয়োজনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপে রচিত হতে পারে; যেখানে প্রচ্ছদের শিরোনামের হরফ থেকে শুরু করে পুরো ডিজাইনের আমূল পরিবর্তন ঘটে থাকে। ফলে বিভিন্ন সময়ের পাঠক প্রচ্ছদে নতুন নতুন শিল্পীমনের বিচিত্রতার স্বাদ পায়; খুঁজে পায় সামাজিক পরিবর্তনের নিত্য নতুন ধ্যান-ধারণা। (Finkelstein, McCleery, 2007 : 11)

বাংলা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গবেষণামূলক লেখা, ইতিহাস– ইত্যাদি নানান বিষয়ের ওপর লেখা পাণ্ডুলিপির আভাস প্রচ্ছদে চিহ্নিত হয়; যেখানে অভিব্যক্তিময় নকশা পরিস্ফুট হয় শিল্পীমনের বিমূর্ত অনুভূতির সংমিশ্রণে। এই অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে শিল্পী প্রচ্ছদ রচনায় আঙ্গিক ও কৌশলগত কিছু পদ্ধতির আশ্রয় নেন; যেমন— বিষয়বস্তুর মেজাজ বুঝে কখনও ইলাস্ট্রেশন, কখনও ফটোগ্রাফি, কখনও উভয়ের সংমিশ্রণ, আবার কখনও বা শুধু টাইপোগ্রাফি বা হরফের সাহায্যে প্রচ্ছদের ভাষাকে বোধগম্য করার প্রয়াস পান। লিখিত টেক্সটকে ভাষায় রূপান্তরিত করা সহজ হয় শুধু সেই ভাষার আক্ষরিক অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে। কিন্তু লিখিত ভাষা এবং সেই ভাষা থেকে উদ্ভূত প্রচ্ছদে দৃশ্যায়িত ডিজাইনের ভাষা কি একই রূপে বিন্যস্ত হয়? যেহেতু বিষয়বস্তুর সমস্ত রূপকল্প শুধুমাত্র প্রচ্ছদের একটি পৃষ্ঠায় দৃশ্যায়িত করা সম্ভব নয়, তাই বিভিন্ন চিহ্ন (sign)-এর ওপর নির্ভর করে শিল্পী আলংকারিক ধারার সমন্বয়ে নির্দিষ্ট বক্তব্যকে দৃশ্যগতভাবে ব্যক্ত করেন প্রচ্ছদে। এক্ষেত্রে একজন শিল্পীর নিজস্ব স্টাইল, দক্ষতা, তাঁর বিশেষ কল্পনাশক্তি — সবই তাঁর সৃষ্ট শিল্পের ওপর ক্রিয়া করে। ফলে নানান ধরনের চিহ্ন হিসেবে প্রচ্ছদে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান, যেমন— কাগজ, রং, রেখা, টেক্সচার, অক্ষর — ইত্যাদির বিভিন্ন বাঙ্ময় উপস্থাপনা বিশ্লেষণ করে নানান বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত অর্থ শনাক্ত করার সুযোগ বিদ্যমান।

চিহ্নবিজ্ঞান

প্রচ্ছদ রচনা নান্দনিক ও শৈল্পিকতায় পরিপুষ্ট হয় আলংকারিক ধারার সমন্বয়ে। এই অলংকারের অন্তর্জাল ভেদ করে প্রচ্ছদের রস অনুধাবনের উপায় হিসেবে চিত্রিত

চিহ্নরূপী উপাদান বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচ্য। এক্ষেত্রে বিশ শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর তত্ত্বকাঠামো 'চিহ্নবিজ্ঞান'-এর তাৎপর্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। চিহ্নবৈজ্ঞানিক গবেষণায় মূল আলোচ্য বিষয় হলো — চিহ্ন; যা নির্দিষ্ট প্রতিবেশে বিষয়বস্তু সম্পর্কে মানুষের যে মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধি জন্ম নেয় তার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত ও প্রচলিত হয়। একই ঐতিহ্য কাঠামোতে অবস্থিত প্রতিটি চিহ্নের অবস্থান ও পরিচিতি নির্ধারিত হয় নিজ স্বাতন্ত্র্যসূচক বিশেষত্বের মাধ্যমে। (শাহরিয়ার, ২০০৮ : ৪)। সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনন্দ দ্য সোস্যুর (Ferdinand de Saussure)-এর তাত্ত্বিক ধারণা অনুযায়ী, চিহ্ন হলো — চিহ্নায়ক/দ্যোতক (signifier) ও চিহ্নায়িত/দ্যোতিত (signified)-এর মিলিত রূপ। সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ হলো চিহ্নের চিহ্নায়ক। অর্থাৎ চোখ দিয়ে যা কিছু দেখা যায় এবং কান দিয়ে যা কিছু শোনা যায় — এ সব কিছুই চিহ্নায়ক বা দ্যোতক (signifier)-এর অন্তর্ভুক্ত। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের অন্তরালের যে ব্যাখ্যা বা বিমূর্ত ধারণা বা উপলব্ধি — তা ই হলো চিহ্নায়িত বা দ্যোতিত। কিন্তু চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত — সোস্যুর-এর এই দ্বিকোণ মডেল নির্দিষ্ট বস্তু বা প্রসঙ্গের ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণ করে না। ফলে তিনি সংকেত (code)-এর ধারণার ব্যাখ্যা দেন। সংকেত (code) হলো সেই সূত্র যে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত কী পরিস্থিতিতে চিহ্নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে তার ব্যাখ্যা দেয়। অর্থাৎ চিহ্নকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। একটি চিহ্ন তখনই 'চিহ্ন' হিসেবে রূপ লাভ করে যখন সংকেত-এর সাহায্যে তাকে পরিচালিত করা যায়; যেমন : প্রতিবেশ অনপেক্ষভাবে লাল রং কোন চিহ্ন নয়। কিন্তু যখন লাল রং দিয়ে নির্দিষ্ট কোনো অবয়ব তৈরি করা হয় এবং উক্ত অবয়ব যদি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিমন্ডল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নির্দিষ্ট কোনো ধারণা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি নির্দেশ করে তখন তা চিহ্ন রূপে প্রতিফলিত হয়। আর এই চিহ্নের 'চিহ্ন' হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে নির্দিষ্ট সংকেত; যা নির্দিষ্ট প্রতিবেশে ধীরে ধীরে জন্ম নেয়া মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ধারণার (concept) চিহ্নিত রূপ। (Charler, B., Albert, S. Albert, R. (ed), 1966 : 66-78)।

আমেরিকান দার্শনিক ও বিজ্ঞানী চার্লস স্যান্ডার্সপার্স (Charles Sanders Peirce)-এর ধারণা অনুযায়ী, চিহ্ন তিন রকমভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। ১) আইকন (icon) — এই ধরনের চিহ্নের ক্ষেত্রে চিহ্নায়ক বা উপাদান যা প্রদর্শন করে, চিহ্নায়িত ঠিক সেই অর্থই প্রকাশ করে। যেমন, 'ফুল' শব্দটি দিয়ে একটি 'ফুল'কে বোঝানোই হলো ফুলের চিহ্নের আইকন। ২) ইনডেক্স (index) — এই ধরনের চিহ্নের ক্ষেত্রে চিহ্নায়ক কোনো বিষয়বস্তু বা ধারণার সরাসরি ব্যাখ্যা রূপায়ণ করে না, তবে যৌক্তিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে পরোক্ষভাবে উক্ত বিষয় বা ধারণার ইঙ্গিত দেয়। সেক্ষেত্রে ফুলের গন্ধ পাওয়া মানে হলো, আশেপাশে ফুলের গাছ রয়েছে। তবে তা পুরোপুরি নিশ্চিত নয়; একটি স্বাভাবিক যৌক্তিক সম্ভাবনা মাত্র। ৩) প্রতীক (symbol) — এই ধরনের চিহ্ন একটি বিমূর্ত প্রক্রিয়ায় চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে। আপাতদৃষ্টিতে বাস্তবসম্মত বা প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক চিহ্নটির সঙ্গে থাকে না। এক্ষেত্রে

'ফুলের চিহ্ন দিয়ে হয়ত নরম, নিষ্পাপ বা পবিত্রতা বোঝানো হতে পারে, যার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে ফুলের বাহ্যিক গঠন বা প্রকৃতির কোনো সাদৃশ্য নেই। এই সাদৃশ্য মানুষের সৃষ্টি, যাতে বোঝানো হয় 'ফুল' পবিত্রতা বা অপাপবিদ্ধতার প্রতীক। (Justus, B (ed.), 1955 : 98-119) এভাবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয়ে একটি চিহ্ন প্রতীক রূপে প্রচলিত হয়ে থাকে। একটি চিহ্নায়ক যেমন অনেক সংকেত বা প্রতীক রূপে ব্যাখ্যায়িত হতে পারে, তেমনি একটিমাত্র ব্যাখ্যা বা চিহ্নায়িতের জন্য থাকতে পারে অনেক উপাদান বা চিহ্নায়ক। আলোচ্য নির্দিষ্ট প্রকার প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে চিহ্নবিজ্ঞানের তত্ত্ব কীভাবে দৃশ্যগত বক্তব্যে যুক্ত হতে পারে তা সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে।

বিভিন্ন দৃশ্যগত যোগাযোগের মাধ্যম টাইপোগ্রাফি বা লিপিশিল্পকে ধারণ করে প্রসার লাভ করে। বর্তমান যুগে এটি শুধু কোনো ডিজাইনের বার্তা প্রদানকারী রূপেই সোচ্চার নয় বরং ক্ষেত্রবিশেষে ডিজাইনের পূর্ণাঙ্গ সত্তা হিসেবেও সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। বইয়ের প্রচ্ছদেও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই টাইপোগ্রাফি বা লিপিশিল্প। কেননা, প্রচ্ছদের মূল কাঠামো গড়ে ওঠে বইয়ের নামের উপর ভিত্তি করে হরফ বা অক্ষর বিন্যাসের মাধ্যমে। সুন্দর ইলাস্ট্রেশন বা ফটোগ্রাফ সহযোগে সৃষ্ট একটি প্রচ্ছদ ডিজাইন ব্যর্থ হয়ে যায় যদি শিরোনামের অক্ষরবিন্যাস, শৈলী, মাপ অথবা অবস্থান ঠিকভাবে প্রয়োগ করা না হয়।শুধু শিরোনাম নয়, টাইপোগ্রাফির এই অবাধ বিচরণ কখনও কখনও প্রচ্ছদে পূর্ণাঙ্গ ডিজাইনের পরিপূরক হিসেবে নিজস্ব পরিচিতি তুলে ধরে। এই ধরনের প্রচ্ছদ 'টাইপোগ্রাফিক প্রচ্ছদ' নামে পরিচিত। বাংলাদেশেও এই ধরনের প্রচ্ছদ নির্মাণে বিচিত্রতা দেখা যায়, যা প্রকাশনা শিল্পে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। সে-কারণে বাংলাদেশের বাংলা বইয়ের টাইপোগ্রাফিক বা অক্ষরপ্রধান প্রচ্ছদ বিচার বিশ্লেষণের দাবি রাখে।বর্তমান আলোচনায় মূলত টাইপোগ্রাফিক চিহ্নবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত টাইপোগ্রাফিক প্রচ্ছদের দৃশ্যগত বক্তব্যে এই তত্ত্বের প্রয়োগ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

টাইপোগ্রাফি এবং চিহ্নবিজ্ঞান

এক কথায় বলা যায়, টাইপোগ্রাফি বা লিপিশিল্প হলো, হরফ বা অক্ষরনির্ভর ডিজাইন। বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষরকে নানান আকৃতিতে সম-অসম মাপে পাশাপাশি বা ওপর-নিচ একই অথবা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে সাজিয়ে দৃষ্টিনন্দন শব্দ-বাক্য-নকশা করাই হলো টাইপোগ্রাফি। প্রতিটি অক্ষরকে একটি নির্দিষ্ট শৈলীতে (style) ডিজাইন করে একই চেহারার (typeface) একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণমালা তৈরির মাধ্যমে গড়ে ওঠে এক একটি typefamily বা Font। অঙ্ক ও বিভিন্ন বিরামচিহ্নও এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। একটি একক হরফকে সুন্দর ও নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নানান কারিগরি পদ্ধতিতে একটি নতুন Font তৈরি করা পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াই একটি

টাইপোগ্রাফিক প্রক্রিয়া, যা 'Fontography' নামেও পরিচিত। (মাকসুদুর, ১৯৯৫ : ১৩)।

খ্রিষ্টীয় পনেরো শতকের মাঝামাঝি কিংবা তার আগে টাইপোগ্রাফি বলে কিছু ছিল না। এই শিল্পের সূচনা ঘটে গুটেনবার্গ[১] আবিষ্কৃত বিচল হরফ[২] (moveable type)-এর সময় থেকে। তারই ধারাবাহিকতায় ইউরোপের ছাপার রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলা বিচল হরফ[৩]-এর প্রথম নমুনা দেখা যায় ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে হুগলিতে ছাপা ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড-এর ইংরেজিতে লেখা *A Grammar of the Bengal Language* বইতে[৪] (অশোক, ২০১৩ : ১৩)। এই বই থেকেই বাংলা অক্ষরে মুদ্রণের ইতিহাস শুরু হলেও বাংলা বইয়ের সূচনা ঘটে উত্তর ও মধ্য কলকাতার বাঙালি স্বত্বাধিকারীদের ছাপা বটতলার বই[৫]-এর মাধ্যমে। (মামুন, ২০০৭ : ১৯)

১৮ শতক থেকে মূলত টাইপোগ্রাফি একটি আলংকারিক উপাদান হিসেবে প্রকাশনাশিল্পে স্থান পেতে থাকে; পাশাপাশি সমসাময়িক সমাজে একটি নিজস্ব ভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। (Siebert, 2015)

১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাউহাউস'[৬] (Bauhaus)-এর একজন ছাত্র হার্বার্ট বেয়ার (Herbert Bayer) 'Universal' শিরোনামে তাঁর বিখ্যাত Sans-serif type -বিকাশের জন্য ন্যূনতম উপাদানভিত্তিক কাঠামোর নীতি (principles of reductive minimalism) ব্যবহার করেন এবং এটি পুরো 'বাউহাউস' স্কুলের শিল্পরুচি তৈরির মূল চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। এতে অনেক শিল্পী অনুপ্রাণিত হন। তাঁদের অন্যতম জ্যাঁ টিসিকল্ড (Jan Tschichold), যিনি বাউহাউস কর্তৃক সৃষ্ট গঠন প্রণালি (structure) ও বিন্যাস (composition) পদ্ধতি আয়ত্ত করে টাইপোগ্রাফির একটি নতুন ধারা উদ্ভাবন করেন। ১৯২৮ সালে এই ধারায় তৈরি তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি 'The New Typography' প্রকাশিত হয়; যার প্রতিফলনে পরিমিত ছন্দে টাইপোগ্রাফির চর্চা শুরু হয় এবং এর মাধ্যমে প্রকাশনা জগতেই শুধু নয়, সমগ্র গ্রাফিক ডিজাইন ও যোগাযোগ শৈলীতেও একটি নতুন মাত্রার সংযোগ সাধিত হয়। (Smirna, 2017)

কয়েক দশক আগেও টাইপোগ্রাফিকে বিমূর্ত একটি মাধ্যম হিসেবে ধরা হতো, যা কিনা শুধু মুখের কথাকে লিখিত রূপে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হতো। কিন্তু বর্তমানে একে অর্থবোধক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক বা একাধিক অক্ষর বা হরফের বিচিত্র পরিবর্তন ও নান্দনিক উপস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (action), চিন্তা-ধারণা (idea), সম্পর্ক (relationship), আবেগ (emotions), অনুভূতি (feeling), মনের ভাব বা মেজাজ (mood) ইত্যাদি প্রকাশ করা যায় (Van leeuwen, 2006 : 139-155)। আবার, কোনো একটি কম্পোজিশনে সামগ্রিক অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে ছবির বিকল্প হিসেবেও টাইপোগ্রাফি স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হতে পারে।

(Machin, 2007 : 87)। অধ্যাপক থিও ভ্যান লিউয়েন (Van Leeuwn, 2005b : 137-143)-এর গবেষণা অনুযায়ী, টাইপোগ্রাফির চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশে-ষণের দুটো দিক রয়েছে, যেমন — ১) গূঢ়ার্থ (connotation) : কোনো শব্দের মূল অর্থের অতিরিক্ত কোনো অর্থ। টাইপোগ্রাফিকে প্রচলিত ব্যবহারের বাইরে ব্যবহার করা; অর্থাৎ হরফ বা অক্ষরসমূহকে স্বাভাবিক লেখার কাজের বাইরে ডিজাইন হিসেবে ব্যবহার করাই হলো টাইপোগ্রাফির গূঢ়ার্থ। ২) রূপক (metaphor) — টাইপোগ্রাফির ক্ষেত্রে রূপক হলো চিহ্নায়কের অর্থাৎ অক্ষর বা হরফের দৃশ্যগত অবয়ব এবং চিহ্নায়িতের সঙ্গে সাদৃশ্য। এর উৎস নির্ধারিত হয় দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনা-অভিজ্ঞতা ও অর্জিত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে। টাইপোগ্রাফিক রূপক দুভাবে কাজ করে। ১) আইকন ও ২) ইনডেক্স। পূর্বে উল্লেখিত পার্স (Peirce)-এর আইকন এবং ইনডেক্স-এর ধারণার মতো একই রূপে টাইপোগ্রাফির এই দুই রূপক কাজ করে। এক্ষেত্রে, যে বস্তুটি শিল্পী দৃশ্যায়িত করতে চান অক্ষর সাজানোর মধ্য দিয়ে হুবহু সেই বস্তুর অবয়ব বা ফর্ম তৈরি করাই হলো আইকন এবং অক্ষরসমূহ ব্যবহার করে বস্তুর একটি ধারণা তৈরি করা হলো ইনডেক্স। (Van Leeuwen, 2005a : 29-36)

ক

খ

'ক'-চিত্রে 'মেঘদূত' শব্দের অক্ষরগুলি দিয়ে বাস্তবিকই মেঘ-ই আঁকা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রচ্ছদটিতে অক্ষরগুলি আইকন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

'খ'-চিত্রের প্রচ্ছদটিতে অক্ষরগুলি দিয়ে বৃষ্টি আঁকা হয়নি, শুধু তিনটি — 'র' 'র' এবং 'ব' অক্ষর দিয়ে বৃষ্টির বিভিন্ন ধরনের ফোঁটা বোঝানো হয়েছে, যাতে বৃষ্টি সংশ্লিষ্ট ধারণা প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এই তিনটি বর্ণ ইনডেক্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

রং তত্ত্ব ও চিহ্নবিজ্ঞান

রং এমন একটি রঞ্জক পদার্থ যা বিভিন্ন বস্তুর পরিচিতি (identity) চিহ্নিতকরণে প্রধান ভূমিকা পালন করে। রঙের কারণেই মূলত যে কোনো বস্তুর পার্শ্বরেখা বা প্রান্তসীমা (edge) দৃশ্যায়িত হয়; ফলে একটি বস্তু থেকে আরেকটি বস্তুকে আলাদা করা যায়। ১৬৭২ সালে বিজ্ঞানী আইজাক নিউটনের প্রকাশিত কিছু গবেষণা থেকে আধুনিক রংতত্ত্বের ধারণা সৃষ্টি হয়। তিনিই সর্বপ্রথম রংধনুকে অনুধাবন করে প্রিজমের মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণের সাহায্যে রঙের উপাদান নির্ণয় করেন : লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল এবং বেগনি ইত্যাদি এবং ১৭০৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানের ওপর লেখা তাঁর *Opticks*-বইতে চক্র আকারে (color wheel) রঙের চিত্র উপস্থাপন করেন। এরই সূত্র ধরে ১৮১০ সালেবহুমাত্রিক মেধাবী জার্মান লেখক জোহান ওলগ্যাঙ গোথে (Johann Wolfgang Goethe) রঙের চক্রকে উন্নত করে প্রত্যেক রংকে সংবেদনশীল এবং মনস্তাত্ত্বিক রূপে বর্ণনা করেন; যেখানে নীল রং শীতলতার এবং হলুদ রং উষ্ণতার অনুভূতি জন্ম দেয়। তিনি সকল রংকে দুটি দলে বিভক্ত করেন — লাল + কমলা + হলুদ এবং সবুজ + বেগনি + নীল। প্রথম দলের রং উৎসাহ এবং চিত্তাকর্ষণ উৎপাদন করে এবং দ্বিতীয় দলের রং দুর্বলতা এবং অনিশ্চিত অনুভূতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। (Jackson, Amy: Study.com)। পরবর্তীকালে 'বাউহাউজ'-এর দু-জন শিল্পী ও তত্ত্ববিদ জোসেফ অ্যালবার্স (Josef Albers) এবং জোহানেস ইটেন (Johannes Itten) রং তত্ত্বের ধারণায় বিশেষ অবদান রাখেন, যা বিভিন্ন বিষয়বস্তু দেখার ক্ষেত্রে নানান রঙের পারস্পরিক সম্পর্কগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় (Holden, 2007 : 26)। প্রসঙ্গত, হলুদ রংটি লাল রঙের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে; আবার বেগনি রঙের মাঝে তা অনুজ্জ্বলতা প্রদর্শন করে। ফলে একই রং (হলুদ) দেখতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম দেখায় শুধু পারিপার্শ্বিক রঙের প্রভাবের কারণে।

প্রকৃতিতে রং একটি সহজ ও দৈনন্দিন দৃশ্য হিসেবে অনুভূত হলেও নির্দিষ্ট পরিবেশে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রং চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে;উপরন্তু এটি মানবসত্তার বিভিন্ন স্তরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে — একদিকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তর এবং অন্যদিকে ব্যক্তিগত স্তর। ফলে একই রং ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিফলিত হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে, যা 'রংতত্ত্ব'-এর ধারণা নিয়ে সৃষ্টি এবং সংস্কৃতি দ্বারা তৈরি একটি অর্থ ব্যবস্থার কাঠামোর মাধ্যমে মূলত পরিচালিত হয়। বিভিন্ন সমাজে এই রং ভিত্তিক চিহ্ন তৈরি হয় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে (Robinson, 2017)। নিম্নলিখিত প্রধান চারটি রংকে এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যায় :

লাল রং : ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভয়, আগুন, সম্পদ, শক্তি, বিশুদ্ধতা, উর্বরতা, ভালোবাসা, সৌন্দর্য বোঝায়; এখানে বিয়ের রং লাল। দক্ষিণ আফ্রিকায় — শোকের চিহ্ন; চীনে — ভাগ্য, সমৃদ্ধি, সুখ এবং দীর্ঘ আয়ু কামনার জন্য কোনো অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের চিহ্ন।

হলুদ রং : জার্মানিতে ঈর্ষার চিহ্ন, চীনে এই রং যেকোন অশ্লীল রচনা (pornography)-কে প্রতিনিধিত্ব করে। আবার আফ্রিকায় এই রং নির্দিষ্ট উচ্চ পদবীদের জন্য সংরক্ষিত; জাপানে এটি সাহসিকতা, পরিমার্জনা ইত্যাদির চিহ্ন।

নীল রং : এই রং মাতৃগর্ভের একটি প্রতীক এবং ছেলে বাচ্চার জন্মকে প্রতিনিধিত্ব করে, আবার চীনে এটি নারীর রং। পাশ্চাত্যে এই রং বিষণ্ণতাবোধের সাথে সম্পর্কযুক্ত; আবার শান্ত, শীতলভাবও প্রকাশ করে; যা আস্থা, নিরাপত্তা এবং কর্তৃত্বের প্রতীক। পূর্ব দেশে এই রঙের অর্থ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং এটি স্বর্গ, আধ্যাত্মিকতা ও অমরত্বের চিহ্ন। ইহুদি ধর্মে এই রং পবিত্রতা ও দেবত্বের অংশ। আবার সনাতন ধর্মে এটি কৃষ্ণের দেহের রং, যিনি প্রেম ও আনন্দকে সংমিশ্রণ করেন এবং বেদনা ও পাপকে ধ্বংস করেন।

সবুজ রং : পাশ্চাত্যে এই রং ভাগ্য, প্রকৃতি, সজীবতা, পরিবেশগত সচেতনতা, ধন-সম্পদ, আবার অনেক সময় অনভিজ্ঞতা আর ঈর্ষার চিহ্ন। মেক্সিকোতে এটি স্বাধীনতার প্রতীক; দক্ষিণ আমেরিকার অনেক সংস্কৃতিতে এই রং মৃত্যুর চিহ্ন। মধ্যপ্রাচ্যে এটি উর্বরতা, ভাগ্য, সম্পদ; পূর্ব দেশে এটি যৌবন এবং নতুন জীবনের চিহ্ন। চীনে এই রং ব্যভিচারের প্রতীক।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি রং কোনো কিছুকে চিহ্নায়িত করে, এমনকি একই সংস্কৃতিতে একই রং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে নির্দেশ করে; যা মূলত ভিন্ন পরিবেশে নির্দিষ্ট সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত।

টাইপোগ্রাফির মতো রঙের চিহ্ন ও আইকন (icon), ইনডেক্স (index) ও প্রতীক (symbol)-এর মাধ্যমে চিহ্নায়িত হয়। এক্ষেত্রে আইকন সাদ শ্যের (resemblance), ইনডেক্স সান্নিধ্য বা সংস্পর্শতা (contiguity) এবং প্রতীক প্রথাগত চরিত্র (conventionality)-এর ধারণা দেয়। যখন মানসিক সংযুক্তির (psychological associations) মাধ্যমে রঙের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয় তখন সাধারণত সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়। যেমন— আগুন, সূর্য এবং তাপের সাথে কমলা, লাল ও হলুদের সাদৃশ্য (এ কারণেই হয়ত এই রংগুলো উষ্ণ রং হিসেবে বিবেচিত)। এভাবে রং আইকন (icon) চিহ্ন হিসেবে কাজ করতে পারে; আবার নির্দিষ্ট রঙের বিষয়বস্তু তার নিজস্ব রঙের মাধ্যমেও চিত্রিত হতে পারে। যেমন: লাল রঙের মাধ্যমে রক্তকে এবং নীল রং দিয়ে আকাশকে উপস্থাপন করা ইত্যাদি।

ইনডেক্স হলো এমন এক ধরনের চিহ্ন যা তার নিজের এবং যাকে প্রকাশ করে তার মধ্যে কাল ও স্থানের বাস্তব ও কায়িক সম্পর্ক তৈরি করে। অর্থাৎ চিহ্ন এবং বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান নির্দেশ করে ইনডেক্স (Caivano, 1998 : 391-399)। রঙের ইনডেক্স চিহ্ন তিন শ্রেণিতে বিভক্ত— ক) ইশারা বা সংকেত (signals), খ) সূত্র (clues), গ) উপসর্গ (symptoms)।

ক) ‘ইশারা’ বা ‘সংকেত’ (signals) এমন একটি চিহ্ন যেখানে কোন বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে প্রদর্শিত হয়; যেমন : রাস্তায় ট্রাফিক সিগনালের লাল রঙের আলো সংকেত দেয়ার পর যানবাহনগুলোর চলাচল বন্ধ হয়, আবার সবুজ রঙের আলো এর বিপরীত সংকেত দেয়। যদি আকাশে কালো রঙের মেঘ দেখা যায় তবে তা বৃষ্টি হওয়ার সংকেত বহন করে।

খ) ‘সূত্র’ হলো এমন চিহ্ন যা বিষয় বা ঘটনার ঘটে যাওয়ার পর উক্ত ঘটনার অবশিষ্ট অংশ প্রদর্শন করে; যেমন : ধরা যাক, একটি কাপড়ে কোনো এক সময়ে কালো কালি লেগেছিল,নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেই কালো দাগ (spot)-এর অবশিষ্টাংশ হলো ‘সূত্র’ (clues), যা থেকে অনুধাবন করা যাবে এই দাগ আসলে কিসের বা আসলে কী ঘটেছিল।

গ) ‘উপসর্গ’ (symptoms) হলো এমন এক চিহ্ন যা কোনো একটি ঘটনার কারণে আবির্ভূত হয় এবং তার বিষয়বস্তুর সাথে একই সময়ে ঘটে, যেমন : গালে লালচে রং লজ্জার চিহ্ন; অর্থাৎ লজ্জা পাওয়ার কারণে গাল লালচে রং ধারণ করে। এক্ষেত্রে ‘কারণ’ অদৃশ্য হওয়া মাত্র চিহ্নটিও অদৃশ্য হয়ে যায়।

অতএব বলা যায় যে, ‘সংকেত’ চিহ্নটি পরিচালিত হয় সাধারণত পরিবহণ চালকদের মাঝে, যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রত্যাশিত। গোয়েন্দা বা পুলিশদের মাঝে ‘সূত্র’ চিহ্নটি পরিচালিত হয়, যার সাহায্যে কোনো ঘটনার পূর্ব পরিস্থিতি অনুমান করা যায় এবং ‘উপসর্গ’ চিহ্নটি পরিচালনা করেন সাধারণত চিকিৎসকগণ;, যা দ্বারা রোগীর রোগ নির্ণয় করা যায়। এভাবে রঙের ইনডেক্স চিহ্ন পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলে বিরাজ করে থাকে। (Caivano, 1998 : 398)

তৃতীয় হলো প্রতীক। এই চিহ্ন দিয়ে এক বা একাধিক শব্দ, অনুমান বা যুক্তি বোঝানো হতে পারে, যা একটি প্রচলিত বা অভ্যাসগত নিয়মের ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর সাথে আপাতদৃষ্টিতে চিহ্নের সাদৃশ্য বা সংস্পর্শতা কোনোটাই নেই; কিন্তু প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বা প্রথাগত নিয়মের সাথে এই চিহ্ন সম্পর্কযুক্ত। যেমন : লাল রঙের অর্থ এখানে বিপদ, সবুজ রঙের অর্থ নিরাপত্তা, যা ‘সংকেত’-এর লাল ও সবুজ রঙের অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রকাশ করে প্রচলিত ধারণার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। অর্থাৎ চিহ্ন স্থায়ীভাবে এক বা একাধিক শ্রেণিতে বিচরণ করে তা নয়, প্রসঙ্গ অনুযায়ী তা পরিবর্তনশীল; যেখানে এক বা একাধিক রং একটি ক্ষেত্রে হয়তো ‘সংকেত’, কিন্তু অন্য প্রেক্ষাপটে তা প্রতীক ও হতে পারে। (Sebeok, 1976 : 134)

তবে, জটিল প্রতীক তৈরির ক্ষেত্রে রং সাধারণত বিষয়বস্তুর অন্যান্য অংশ, যেমন— আকার-আকৃতি, টেক্সচারের মধ্যে অধিক মাত্রায় প্রতীকী উপাদান হিসেবে কাজ করে; যেমন : বিভিন্ন ধরনের পতাকা (flags), ধ্বজা বা ক্ষুদ্র পতাকা (pennants), রূপকবর্ণনা (allegories), গৌরবান্বিত প্রতীক চিহ্ন (emblems), জাতীয় প্রতীক (coats of arms), ট্রেডমার্ক (trademarks), লোগো (logos) ইত্যাদি। বর্তমান

আলোচ্য প্রচ্ছদসমূহের ক্ষেত্রে চিত্রিত বিভিন্ন ধরনের রঙের চিহ্ন এবং তার অন্তর্নিহিত অর্থ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চিহ্নবিজ্ঞানের আলোকে টাইপোগ্রাফিক প্রচ্ছদ

সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে, অর্থাৎ অক্ষরের গূঢ়ার্থ বা রূপক অথবা উভয়ের যথাযথ বিন্যাসের সাহায্যে টাইপোগ্রাফিক বইয়ের প্রচ্ছদে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাব বা অনুভূতি প্রকাশ করা যায়। এই ধরনের প্রচ্ছদ দুইভাবে উপস্থাপিত হয় : ১) ন্যূনতম উপাদানের সমন্বয়ে নিরাভরণ প্রচ্ছদ, অর্থাৎ এক রঙা পটের ওপর শুধু বইয়ের নাম ও লেখকের নাম সহযোগে যে প্রচ্ছদগুলো নির্মিত হয়। এক্ষেত্রে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস প্রমোশনস ডিরেক্টর লেভি স্টাহ্‌ল (Levi Stahl)-এর মতে কখনও কখনও এই ধরনের নিরাভরণ টাইপোগ্রাফিক প্রচ্ছদ কোনো বইকে উপস্থাপন করার সবচেয়ে ভালো উপায়। যদি বইয়ের শিরোনাম (title) বিষয়বস্তুকে ভালোভাবে প্রকাশ করে; সেক্ষেত্রে ছবি (image) ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠকদের বিভ্রান্ত না করাই শ্রেয়। অথবা যদি বইয়ের শিরোনাম খুবই স্পষ্ট এবং বিষয়বস্তু খুব জটিল হয় সেক্ষেত্রে ছবির মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য এবং পাঠকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত করতে পারে। তবে, যতই ন্যূনতম পরিসরে ব্যবহৃত হোক না কেন, উক্ত উপাদান বিন্যস্ত হয় শিল্পীর নিপুণ কুশলতায়, যেখানে দৃশ্যায়িত হতে পারে কোনো নির্দিষ্ট অনুভূতির আভাস।

আরেক ধরনের টাইপোগ্রাফিক প্রচ্ছদে শুধু অক্ষরকে প্রাধান্য দিয়ে অলংকরণ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে কালানুক্রমে প্রচ্ছদে প্রথাগত অক্ষরের পাশাপাশি ডিজাইন-সংক্রান্ত নানাবিধ উপাদান যুক্ত হচ্ছে। ফলে, অক্ষর বিন্যাস একদিকে চিত্রিত হচ্ছে নতুন আঙ্গিকে নান্দনিক ছন্দে, অন্যদিকে উপাদানে নতুন নতুন বিভিন্ন চিহ্ন, সংকেত, প্রতীক যুক্ত হয়ে প্রচ্ছদে সৃষ্টি করছে নানান আলংকারিক ফর্ম (form)। ফরাসি সাহিত্য তত্ত্ববিদ জর্ড গ্যানেট (Gérard Genette)-এর মতে, এই আলংকারিক ডিজাইন প্রচ্ছদে বিন্যস্ড় হয় দু-ভাবে। যথা : ১) Paratext — এক্ষেত্রে প্রচ্ছদে রচিত টেক্সট স্বাভাবিকভাবে লিখিত অক্ষর বা অক্ষরের গূঢ়ার্থ অথবা অক্ষরের রূপক এবং উক্ত টেক্সটের বাইরের ফাঁকা জায়গাকে ঘিরে নির্মিত কোনো ডিজাইন অন্যান্য উপাদান সহযোগে নানা ঢঙে বিন্যাসের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ডিজাইনের সঙ্গে একটি সম্পর্ক তৈরি করে। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে ডিজাইনের আদিকাল/বর্তমানকাল এবং পাঠকের পুরাতন ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। এখানে, প্রচ্ছদশিল্পী ও পাঠকের মধ্যে সম্পর্ক, তাদের কর্তৃত্বের বিস্তার প্রচ্ছদে প্রকাশিত বার্তার শক্তিকে নির্ধারণ করে। প্রচ্ছদ শিল্পী ও পাঠকের এই আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে পাঠক কিছু নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে নির্দিষ্ট প্রচ্ছদের মূল্যায়ন করে (Genette, 1997 : 1-2) থাকেন। এক্ষেত্রে একটি প্রচ্ছদের গুণগত মান নির্ণয় করার জন্য আগ্রহী পাঠকের ভাষার লিখিত রূপ (written

language), দৃশ্যগত রূপকল্প (visual image) এবং ডিজাইনের উপাদান (রেখা, আকৃতি, রং, স্পেস, টেক্সচার) ইত্যাদির পার্থক্য ও আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচ্ছদ নির্মাণ করা হয় তার কতটুকু সত্যিকার অর্থে পাঠক গ্রহণ করতে পারছে তার ওপরে paratext হিসেবে প্রচ্ছদের সার্থকতা নির্ভর করে। অপরদিকে ২) Intertext-এ প্রচ্ছদশিল্পী ও পাঠকের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির অদৃশ্য ও জটিল একটি সম্পর্ক। এক্ষেত্রে প্রচ্ছদশিল্পী নিজেই যুগপৎভাবে পাঠক ও ডিজাইনারের ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে পাঠক নিজেও ভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের হতে পারেন; যার প্রচ্ছদ বিশ্লেষণের নিয়ম-নীতি লেখকের থেকে ভিন্ন হতে পারে। Intertext এক্ষেত্রে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনে সক্রিয়া ভূমিকা পালন করে (Cmeciu, D, 1987 : 472)। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট পাঠকের কাছে পরিচিত নয় এমন ভিন্ন সংস্কৃতির বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত বইয়ের প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে প্রচ্ছদ শিল্পীর সৃজনশীলতাই পারে পাঠকের বোধের ক্ষেত্র তৈরি করতে — যা সম্ভব হয় মূলত উপাদান নির্বাচনের সাহায্যে চিহ্নায়ক তৈরি এবং প্রচ্ছদে তার সুষম বিন্যাসের মাধ্যমে। উপাদানগুলি সমকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং সময়ের সঙ্গে তা পরিবর্তনশীল হওয়ায় পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গিরও ক্রমে পরিবর্তন ঘটে। ফলে, এই উপাদান বোঝার জন্য প্রচ্ছদের স্থানিক রচনাকৌশল (spatial compostion) এবং দৃশ্যগত ভাষার ব্যাকরণ (visual grammar) অনুধাবন করা প্রচ্ছদশিল্পী ও পাঠক উভয়ের জন্যই অত্যন্ত জরুরি।

এভাবে Paratext এবং Intertext-এর মাধ্যমে সৃষ্ট একটি আলংকারিক প্রচ্ছদ পরিণত হয় একটি একক রূপকল্পে (Image), যা পাঠককে শুধু বই পড়ার প্রতিই আগ্রহী করে তোলে না, বরং প্রচ্ছদের ডিজাইন সম্পর্কেও কৌতূহলী করে তোলে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রচ্ছদই পাঠকের মনে বইটি সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে প্রভাবিত করে।

বাংলা বইয়ের টাইপোগ্রাফিক প্রচ্ছদ

বাংলা প্রকাশনার প্রারম্ভকালে অধিকাংশ প্রচ্ছদই ছিল মূল বইয়ের ছাপার কাগজের চেয়ে সামান্য ভারি কাগজে উপস্থাপিত হতো, কখনওবা তা হতো সামান্য রঙিন; এই রং ছিল সাধারণত ফিকে লাল অথবা সবুজ/হলুদ। এ সময়ের অধিকাংশ প্রচ্ছদই সাজানো হতো প্রকাশনা-সংক্রান্ত কিছু তথ্য দিয়ে, যেমন — বইয়ের নাম, লেখকের নাম, মুদ্রণকারী, মূল্য ইত্যাদি, যা বর্তমানে বইয়ের প্রিন্টার্স লাইনে দেখা যায়। কিছু কিছু প্রচ্ছদে আমদানিকৃত বর্ডার ব্যবহৃত হতো, যা নিছক অলংকরণ; পাঠ্যবস্তুর সাথে এর কোনো সম্পর্কই থাকত না বলা চলে। (প্রণবেশ, ২০১৭ : ১২)

বাংলা প্রকাশনা জগতে আলাদা করে নজরে পড়ার মতো প্রচ্ছদ দেখা যায় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। পুলিনবিহারী সেনের পরিচালনায় বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থন

বিভাগ[৭] থেকে প্রকাশিত বই-পত্র-পত্রিকার প্রচ্ছদে প্রথম বাংলা অক্ষরের বিচিত্র ব্যবহার উপস্থাপিত হয়। একরঙা পটের ওপর অন্য একটি সমানুরণধর্মী গাঢ় রঙের নক্‌শি-লিপি অথবা ভিন্ন ধরনের অক্ষর বিন্যাসের সমন্বয়ে তৈরি প্রচ্ছদগুলিই টাইপোগ্রাফিক বা অক্ষরপ্রধান প্রচ্ছদ পরিকল্পনার প্রথম সোপান (প্রণবরঞ্জন, ২০১৭ক : ৭-৮)। এক্ষেত্রে হাতের লিপির গতিময়তা বা জ্যামিতিক গড়ন অথবা রেখাধর্মীই অক্ষর শৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য; যাতে কোনো ছবি বা ইলাস্ট্রেশন ছাড়াও এক একটি প্রচ্ছদ সৃষ্টি করেছে আলংকারিক পটভূমি। যদিও হাতের লেখাকে অনুসরণ করেই বাংলা হরফ সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ হয়েছে, তারপরও বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদে একেবারে শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে শিল্পীরা সেই হাতের লেখাকেই ক্যালিগ্রাফি[৮] অথবা টাইপোগ্রাফির সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। তার কারণ বোধহয় এই, বাংলা ছাপা হরফের প্রকারভেদ অনেক স্বল্প, তাছাড়া সহজলভ্য ছাপা হরফের নকশায় রূপান্তর সম্ভাবনা এতই সীমাবদ্ধ যে সেগুলির সাহায্যে আলংকারিক বা ব্যঞ্জনাধর্মী নক্‌শা গঠন করা অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। কাজেই বলা যায়, হাতের লেখাকে ভিত্তি করেই প্রচ্ছদশিল্প কালে কালে একটি সুষম শিল্পকর্ম হিসেবে সাফল্য লাভ করেছে।

বিশ্বভারতী প্রকাশনের হাত ধরেই পরবর্তীকালে দিলীপ গুপ্তর পরিচালনায় 'সিগনেট প্রেস' বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। বইয়ের প্রচ্ছদের আকার-প্রকার, ভেতরের অলংকরণ, টাইপ নির্বাচন, হাফ টাইটেল, টাইটেল ইত্যাদিতে আমূল পরিবর্তন দেখা যায় এক নতুন আধুনিকতায়। বিশ্বভারতীকে যদি বলা হয় আধুনিক তবে, সিগনেটকে বলা যায় 'নব্য আধুনিক'। এক্ষেত্রে প্রচ্ছদসহ বাংলা প্রকাশনার সার্বিক উন্নয়নে এগিয়ে আসেন উদ্ভাবনী নির্মাণশিল্পী — সত্যজিৎ রায়। তিনি বইয়ের বিষয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নানা আয়তন-আকৃতি-শৈলীর অক্ষর বিন্যাস করে প্রচ্ছদের ভাষাকে নক্‌শা বিবরণাত্মক, কখনও বর্ণনাত্মক, আবার কখনও বা ইঙ্গিতময় করে দৃশ্যায়িত করেছেন (প্রণবেশ, ২০১৭ : ১১)। পরবর্তীকালে স্বশিক্ষিত শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী সবচেয়ে উদ্ভাবনী প্রতিভাসম্পন্ন এবং বৈচিত্র্যময় প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। শুধু অক্ষর সাজিয়ে আলংকারিক অথবা অভিব্যক্তিময় নক্‌শা নির্মাণে তিনি পূর্ববর্তী সবার চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় বৈচিত্র্যময় শৈলীর এক একটি অক্ষর বা অক্ষরগুচ্ছ এক বা একাধিক বস্তুর রূপকল্পের আভাস দেয়। বস্তুত, রং, বর্ণান্তর, বর্ণচ্ছায় এবং রং-রেখার বুনট পূর্ণেন্দুর কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। (প্রণবরঞ্জন, ২০১৭খ : ৩১-৩২, ৩৬)

এরই ধারাবাহিকতায় কাজী আবুল কাশেম, জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, খালেদ চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীর মেধা, জ্ঞান ও রুচির সম্মিলনে সাতচলি-শ-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের সূচনা ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকায় আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে একদল শিক্ষিত শিল্পীর হাতেই বাংলাদেশের বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদের নব উত্তরণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এক্ষেত্রে তৎকালীন পাকিস্তানে দায়িত্বপ্রাপ্ত টেক্সট

বুক কমিটির অনেকেই পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এগিয়ে আসেন। কিন্তু প্রচ্ছদের জন্য যথোপযুক্ত একজন শিল্পীকে নিযুক্ত করা, তাঁর ওপর পূর্ণভাবে আস্থা রাখার ক্ষেত্রে মখদুমী এবং আহসান উল্লাহ লাইব্রেরীর মালিক মুহাম্মদ কাশেমের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এর সঙ্গে প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী প্রভৃতিরও নাম করা যায় (মামুন, ২০০৭ : ১৯-২০)। এছাড়া যেসব প্রকাশনা সংস্থা মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ নির্মাণে নতুন ধারা প্রবর্তন করে তাদের অন্যতম ছিল চট্টগ্রামের বইঘর। দেশের অগ্রণী কবিদের নজর-কাড়া কবিতার বই প্রকাশের মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজের সুনাম অর্জন করে তারা। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন ছড়াকার এখলাসউদ্দিন আহমেদ। (প্রণবরঞ্জন, ২০১৭ক : ১০)

বিশ্বভারতীগ্রন্থন বিভাগ থেকে প্রকাশিত অক্ষরপ্রধান প্রচ্ছদ

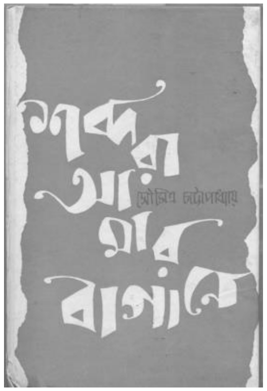

সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী অঙ্কিত পচ্ছদ

প্রচ্ছদ শিল্পের এই দীর্ঘ বিবর্তনে মুদ্রণশিল্পে এসেছে অনেক পরিবর্তন। কাঠখোদাই থেকে লেটার প্রেস হয়ে আজকের কম্পিউটার গ্রাফিক্স-অফসেটের যুগে পৌঁছেছে; যার মাধ্যমে প্রচ্ছদ দৃশ্যায়িত হতে পারে বিচিত্র রূপে।

বাংলাদেশের প্রচ্ছদশিল্পীরা প্রায় সবাই টাইপোগ্রাফিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন — তা হাতের লেখা বা ক্যালিগ্রাফি অথবা ছাপা হরফের সমন্বয়েই হোক না কেন। তবে, তাদের মধ্যে সবাই যে শুধু অক্ষরকে প্রাধান্য দিয়ে আলংকারিক বা অভিব্যক্তিময় নকশায় প্রচ্ছদ নির্মাণ করেছেন তা নয়।বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের ইতিহাসে সর্বপ্রথম টাইপোগ্রাফিক প্রচ্ছদ নির্মাণ করে একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। অনন্য এই প্রচ্ছদশিল্পী বাংলাদেশের বইয়ের সার্বিক প্রচ্ছদ শিল্পে নতুন নতুন অনেক পরিবর্তনের সূচনা করেন। যেমন— বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদে বইয়ের শিরোনাম ও লেখকের নাম তিনি রোমান হরফে ব্যবহার, প্রচ্ছদের এক কোণে বা মাঝামাঝি বা নিচে বা আড়াআড়িভাবে লেখক ও বইয়ের নাম বসানো; বইয়ের নাম ও লেখকের নামের মাঝে একটি বা দুটি দাড়ি দিয়ে এক লাইনে, একই মাপে বা উচ্চতায়

উপস্থাপন ইত্যাদি। এছাড়াও বইয়ের সামনের দিকে প্রচ্ছদ আঁকার চিরাচরিত প্রথা ভেঙে তিনি কখনও সামনের ডিজাইনকে পেছনে পুনরাবৃত্তি করে আবার কখনওবা সামনের ডিজাইনের অংশবিশেষ পেছনে নিয়ে উভয় দিকে প্রচ্ছদ আঁকার প্রথা চালু করেন (মামুন, ২০০৭ : ৯৫-৯৭)। এই ধারা অবলম্বন করে পরবর্তীকালে অন্যরা যেমন : হাশেম খান, রফিকুন নবী, কাজী হাসান হাবীব, মামুন কায়সার, মাসুক হেলাল, আবুল মনসুর, আনোয়ার ফারুক, প্রবীর সেন, কৃষ্ণেন্দু চাকী, ধ্রুব এষ, সব্যসাচী হাজরা প্রমুখ প্রচ্ছদশিল্পী ইলাস্ট্রেশন বা ফটোগ্রাফভিত্তিক প্রচ্ছদের পাশাপাশি শুধু টাইপোগ্রাফি বা অক্ষরকে নির্ভর করে প্রচ্ছদ রচনা করে বাংলাদেশের প্রকাশন শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন।

নির্বাচিত প্রচ্ছদ অলংকরণে চিহ্নবিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রয়োগ

সাধারণত পাঠক একটি প্রচ্ছদের সামগ্রিক গুণাগুণ অনুধাবন করতে পারেন না। কিন্তু প্রচ্ছদশিল্পী নির্দিষ্ট কিছু চিন্ত-ভাবনা থেকে ডিজাইনটি করে থাকেন। তারপরও প্রচ্ছদে এমন কিছু প্রচ্ছন্ন তথ্য-উপাত্ত থাকে, যা শিল্পীর হয়ত উদ্দেশ্য প্রণীত নয়, কিন্তু চারপাশের সামাজিক-স্থানিক পরিমণ্ডল তাতে ইঙ্গিতে আভাসিত হয়ে ওঠে। টাইপোগ্রাফিক প্রচ্ছদ যেহেতু শুধু অক্ষরকে কেন্দ্র করেই উপস্থাপিত হয় সেহেতু শিল্পী অক্ষরকে নানা ঢঙে, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় কখনও পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে, কখনও ক্ষুদ্র উচ্চতায়, কখনও দুয়ের মিশ্রণে বিভিন্ন অভিব্যক্তি সৃষ্টি করেন। ফলে একই চরিত্রের নানান রঙের ও ভিন্ন ধরনের গতিসম্পন্ন অক্ষর দ্বিমাত্রিক পটে নিয়মিত-অনিয়মিত দূরত্বে বিন্যস্ত হয় এবং অক্ষর বিন্যাস ও পটের ফাঁকা জায়গা মিলে তৈরি করে একটি ছন্দ। উপাদান তথা চিহ্নায়কের এই ছন্দের পুনরাবৃত্তিতেই নির্দিষ্ট প্রচ্ছদ নক্‌শা কখনও রূপ লাভ করে আইকন, কখনও ইনডেক্স আবার কখনও বা প্রতীকে, যাতে চিহ্নায়িত থাকতে পারে নানা সময়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক রূপকল্পের ধারণা। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের শিল্পীদের অঙ্কিত কিছু টাইপোগ্রাফিক প্রচ্ছদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

রক্তাক্ত বাংলা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন শিল্পী কামরুল হাসান অঙ্কিত এই বইয়ের প্রচ্ছদের উপাদান তথা চিহ্নায়ক নীল, কালো, সাদা ও লাল রং এবং 'রক্তাক্ত বাংলা' শব্দ দুটির অক্ষরসমূহ বিন্যস্ত হয়েছে বলিষ্ঠ রেখায় স্তম্ভ জাতীয় ফর্ম রূপে। এখানে 'রক্তাক্ত' শব্দটির অভ্যন্তরে এবং 'বাংলা' শব্দটির পুরোটা জুড়ে ব্যবহৃত লাল রং উক্ত শব্দদ্বয়কে আক্ষরিক অর্থে রক্তে রঞ্জিত বাংলাদেশকেউপস্থাপন করেছে। ফলে শব্দ দুটি একদিকে যেমন আইকনে রূপ নিয়েছে, পাশাপাশি লাল রং 'রক্তাক্ত' শব্দের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে রাগ-ক্ষোভ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেনির্দেশ করে ইনডেক্সে রূপান্তরিত

হয়েছে। নিচের 'বাংলা' শব্দটির ক্ষেত্রে আবার এই রং শক্তিশালী, গৌরবাকাঙ্ক্ষিত, দৃঢ় সংকল্পে অঙ্গীকারবদ্ধ একটি দেশকে চিহ্নিত করেছে, যার পেছনের সাদা ও নীল রংয়ের চৌকো আকারের ফর্মগুলি একই সঙ্গে সততা, বিশ্বাস ও দায়িত্বশীলতার ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ লাল রংটি আইকন এবং প্রতীক উভয়রূপে 'বাংলা' শব্দটিতে ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে একটি দেশের অতীতের দুঃখ, হাহাকার, বঞ্চনার অন্ধকারকে ছাপিয়ে অসীম সাহস, উদ্যম, সাফল্য, সংগ্রাম ও দৃঢ়তার পরিচয় তুলে ধরে। এখানে বাংলাদেশকে ঘিরে শিল্পীর নিজস্ব কিছু অনির্বচনীয় চাওয়া থেকে ব্যক্ত হয়েছে 'বাংলা' শব্দটির বিন্যাস। তাই তো দেখা যায় 'বাংলা' শব্দটিকে অব্যক্ত, অজানা, অশুভ, অন্ধকার কালো জমিনের ওপর একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়িত্ব এবং পরিপূর্ণতার আভাস দিতে ব্যবহৃত হয়েছে সাদা মোটা একটি লাইন।এই লাইন এবং 'রক্তাক্ত'-এর মাত্রা আবার একই পুরুত্বের, ফলে 'রক্তাক্ত বাংলা' শব্দ দুটি পরস্পরকে সাধারণ বন্ধনের চেয়েও জড়িয়েছে আরও নিবিড়ভাবে; যেন শব্দ দুটি একে অপরের পরিপূরক। এই রং আশ্বাসের সংকেত দেয় ভবিষ্যতের আলোকিত বাংলাদেশের। প্রচ্ছদটির মাঝ বরাবর লম্বালম্বিভাবে ভাগ হয়ে যাওয়া অংশটি নীল রঙে রঞ্জিত, কিন্তু সেই নীলকে ভেঙে 'রক্তাক্ত' শব্দের মধ্যে প্রবেশ করেছে অশুভ সংকেত কালো রঙের দুটি মোটা পিলার; এটি যেমন খণ্ডিত করেছে নীল রঙের দেয়াল স্বরূপ বিশ্বস্ততাকে, তেমনি কলুষিত করেছে সাদা অক্ষর স্বরূপ পবিত্র তাকে, অর্থাৎ খর্ব করা হয়েছে একটি দেশের সার্বভৌমত্ব। চিহ্নায়ক এখানে সরল এবং সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তাতে চিহ্নায়িত রয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন কথোপকথন; যেখানে পাঠকের স্মৃতির পর্দায় নাড়া দিয়ে যায় সেই রক্তঝরা দিনলিপি, অনুভূত হয় সেই কান্না-আতঙ্ক জর্জরিত অত্যাচারিত মানুষগুলোর চিরতরে হারিয়ে যাওয়া অভিমান, হতাশা, অপমান এবং অব্যক্ত বেদনা।

রৌদ্র করোটিতে

১৯৬৩ সালে বইঘর থেকে প্রকাশিত শামসুর রাহমানের লেখাকাব্যগ্রন্থ। কবিতা পাঠকের কাছে এমন এক অনুভবের জগৎ, যাতে কখনও ধ্বনি, কখনও দৃশ্য আবার কখনওবা স্পর্শের অনুভূতি প্রকাশ পায়। সেই অর্থে কবিতা এক জটিল দীর্ঘ ক্রিয়া। প্রচ্ছদশিল্পীদের মনোজগতে দীর্ঘ পাঠাভ্যাস ব্যতীত এই ক্রিয়া সব সময় যে তেমনভাবে

প্রবেশ করে তা নয়। ফলে বইয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুর দৃশ্যায়িত রূপ স্বাভাবিক কারণেই সবসময় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। শিরোনামের ওপর ভিত্তি করেই শিল্পী মূলত প্রচ্ছদটি রচনা করে থাকেন। কাজেই কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অলংকৃত হয় ফুল, লতা-পাতা, পাখির বিভিন্ন রকম বিন্যাসে। আলোচ্য *রৌদ্র করোটি* কাব্যগ্রন্থটির প্রচ্ছদ রচনার ক্ষেত্রেও কাইয়ুম চৌধুরীচিহ্নায়ক বা উপাদানের অংশ হিসেবে প্রকৃতির এই সহজ-সরল চিরচেনা আকৃতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রচ্ছদে অঙ্কিত সাদা ত্রিভুজাকৃতির অক্ষরগুলির ভেতরের মোটা প্যাঁচানো লাইনের ফুল, লতা-পাতা, পাখির নক্শার নীল রং অনুভূতির নানান রূপকে ব্যক্ত করে। যেহেতু এটি কবিতার বই এতে মনের বিভিন্ন স্তরের আবেগ প্রকাশের অবকাশ রয়েছে; নীল রঙের রেখা দিয়ে যার অনেকখানি চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন শিল্পী। এখানে নীল রং — প্রশান্তি, ভক্তি, অকপটতা, উদ্দীপনা, প্রেম, ভালোবাসা, বেদনা ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অন্যদিকে সাদা রং শুভ্রতা, শুদ্ধতা, বিশ্বাস, সততার অনুভূতির জন্ম দেয়, যা চিহ্নায়িত করছে মনের নানান স্তরের রূপকে।পাশাপাশি ফুল, লতা-পাখির সরল আকৃতির সংকেত বর্ণনা করছে প্রকৃতির সরল এক রূপ; এক্ষেত্রে আকৃতিগুলি প্রকৃতির বিভিন্ন অংশকে সরাসরি নির্দেশ করলেও মূলত এগুলি কবিতার বিভিন্ন শব্দ, ছন্দ, সংজ্ঞার্থ, অর্থ-এর সাথে একাত্মতার আভাস রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

আবার, প্রচ্ছদের জমিনের নীল রংটি আইকন হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, যা নির্দেশ বা চিহ্নায়িত করছে উন্মুক্ত স্থান বা জায়গাকে, যাকে আকাশের প্রতীক রূপে ধারণা করা যায়। কারণ,ত্রিভুজ আকৃতির অক্ষরগুলির ভঙ্গিমা এবং অভ্যন্তরীণ নক্শাগুলি অর্থাৎফুল, লতা-পাতা, পাখির যথাযথ অবস্থান এমন ভাবে চিত্রিত হয়েছে, যাতে চিহ্নিত করে গাছের কিছু লতানো শাখা-প্রশাখার ঊর্ধ্বমুখের অবস্থানকে। এছাড়াও শিরোনাম ও লেখকের নাম উপস্থাপিত হয়েছে প্রচ্ছদের ডান পাশে উল-স্বভাবে, যা আপাতদৃষ্টিতে উঁচু স্থানে ঝুলন্ত অবস্থাকে বোঝায়। উভয়েরই পটভূমিতে শুধু খোলা আকাশকেই কল্পনা করা যায়। কাজেই বলা যায়, অক্ষরসমূহ, আভ্যন্তরীণ নকশা, রং ইত্যাদি সবই এক একটি চিহ্নায়ক। এই চিহ্নায়কসমূহ থেকে তৈরি সংকেত, যেমন, গাছ, আকাশ ইত্যাদি চিহ্নায়িত করছে মানব মনের নানান স্তরের

উপলব্ধির প্রতীক ও প্রকৃতির উপমা, যা মিলেমিশে দৃশ্যায়িত করছে কবিতা তথা বইয়ের বিষয়বস্তুর ধারণার কল্পিত রূপ।

জীবন আমার বোন

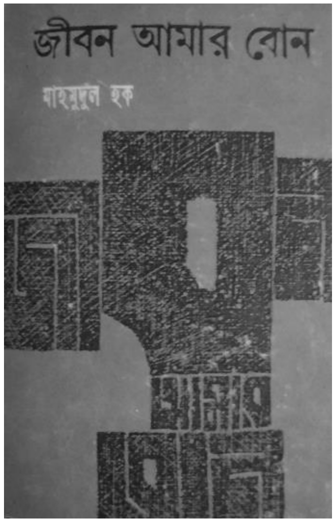

১৯৭৬ সালে বই আকারে প্রকাশিত মাহমুদুল হক রচিত এবং শিল্পী কাজী হাসান হাবিব অঙ্কিত *জীবন আমার বোন* উপন্যাসটির প্রচ্ছদের জমিন রঞ্জিত হয়েছে ম্যাজেন্টা রঙে। নির্দিষ্ট কোন রং দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় ব্যক্ত করে কোন সমাজের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ধারণা বা বিশ্বাস। এক্ষেত্রে এই রং নারীর প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন নারী চরিত্রের নানান অন্তর্নিহিত রূপ প্রচ্ছদটিতে পরিস্ফুট হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা প্রবাহে; যার দৃশ্যায়িত রূপ প্রচ্ছদে একটি মাত্র ম্যাজেন্টা রঙে রঞ্জিত হয়েছে; যে রং ব্যক্ত করে মানুষের আবেগের সেই স্তরকে, যা ধারণ করে প্রেম, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, ধৈর্য, উষ্ণতা, কমনীয়তা, নির্মলতার এক পরিচ্ছন্ন রূপ। আবার জীবনের প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গিতে রক্ষা করে চলে সাদৃশ্য ও ভারসাম্যতা — শারীরিক, মানসিক, আবেগ ও আধ্যাত্মিকভাবে, যা আসলে বাংলার নারী তথা বাংলার মা, বোন, বধূর চিরন্তন রূপ; যাদের প্রভাব ত্বরান্বিত করে সমাজের ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, শক্তিশালী করে মানুষের স্বজ্ঞা, অনুভূতি, শারীরিক ক্ষমতাকে, যাতে তারা জীবনের প্রতিটি দিনের ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতাকে এক বৃহত্তর জ্ঞান ও সচেতনতায় রূপান্তর করতে পারে। অর্থাৎ এখানে শিল্পীর সুপরিকল্পিত একটি মাত্র ম্যাজেন্টা রং শুধু নারীর ধারণাকেই ফুটিয়ে তোলে না, পাশাপাশি বাংলার নারীর চিরন্তন মানসিকতারও পরিচয় ব্যক্ত করে।

অন্যদিকে ছোট বড় অক্ষর বা চিহ্নায়ক মিলে বিন্যস্ত হয়েছে 'জীবন আমার বোন' বাক্যটি।এখানে একদিকে আকৃতি পায় জানালাযুক্ত একটি ঘরের কল্পিত রূপ আবার অন্যদিকে খুঁজে পাওয়া যায় নারীমুখের এক বিমূর্ত আদল, যাতে আয়নায় নিজেকে দেখার এক চিত্র ফুটে ওঠে। এই অবয়ব নির্দেশ করছে সমাজের গৃহস্থ নারীকে, যে বিচরণ করে ঘরের মাঝে, দৃঢ় করে সম্পর্ককে, অটুট রাখে বন্ধনকে। কিন্তু সেই সাথে তুলির আঁচড়ে তৈরি ভাঙ্গা ভাঙ্গা সরু রেখার টেক্সচারে সেই নারীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে প্রকট হয়ে উঠেছে, যেখানে উন্মোচিত হয়েছে সম্পর্কের টানাপড়েন ও জীবনের সেই আদি ও অকৃত্রিম ছন্দপতনের জানা-অজানা কাহিনির প্রতিচ্ছবি। একই সাথে

উপন্যাসের পটভূমি আগাম যুদ্ধের গুরুগম্ভীর ভাবের একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেয়। পাশাপাশি আবার জন্ম না নেয়া শিশুর সেই পরম নির্ভরতার স্থান– মাতৃগর্ভের অস্পষ্ট এক ধারণারও জন্ম দেয় অক্ষরগুলি; যা একই সাথে নারীত্বের প্রতীক, আবার জন্ম না নেয়া স্বাধীনতার বার্তাবাহক। আলোচ্য প্রচ্ছদটিতে জমিন এবং অক্ষরের গূঢ়ার্থ উভয় মিলে যে paratext তৈরি হয়েছে, সেখানে নারী চরিত্রের বিভিন্ন রূপের ধারণা কল্পিত হয়েছে সংকেতের মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন আকৃতি ও রঙের সাহায্যে; যা উপন্যাসের সারমর্মের ইঙ্গিতসূত্র।

বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা

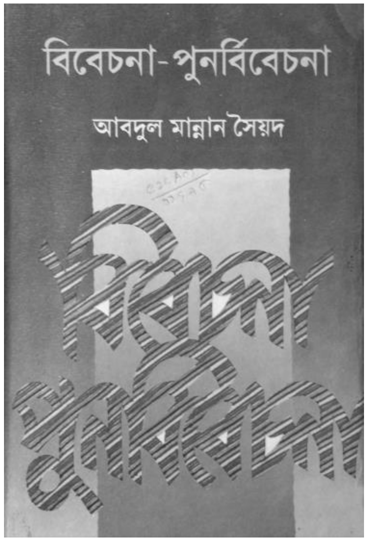

আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর বিভিন্ন সময়ে রচিত প্রবন্ধগুচ্ছের সমন্বয়ে সংকলিত এই বইয়ের প্রচ্ছদ শিল্পী মামুন কায়সার রঙের ক্রমবিন্যাস (gradation) ব্যবহার করে প্রচ্ছদের দ্বিমাত্রিক জমিনকে ত্রিমাত্রিক অনুভূতি দেয়ার চেষ্টা করেছেন। ফলে বিপরীতধর্মী দুটি রঙের ক্রমবিন্যাস আবদ্ধ দেয়ালের মাঝে একটি খোলা জানালার সংকেত তৈরি করেছে।

নীল ও সবুজ রং দুটি উল-স্বভাবে একই রৈখিক ক্রমবিন্যাসে বিন্যস্ত হলেও দুটি ভিন্ন অর্থ বহন করছে এখানে। যদিও নীল রং অনেক ক্ষেত্রেই খোলা স্পেসের অর্থ বহন করে, কিন্তু এক্ষেত্রে চারকোণা প্রচ্ছদের উপরের অংশটির গাঢ় নীল থেকে নিচের দিকে ক্রমান্বয়ে হালকা নীল-এ যাওয়ার অবস্থান উন্মুক্ততা বা প্রশস্ততার পরিবর্তে অচ্ছেদ্য বা জমাট অথবা নিরেট অবস্থানকে চিহ্নিত করছে। আবার ছোটো চারকোনা আকারের মাঝে গাঢ় সবুজ নীচের দিক থেকে ক্রমান্বয়ে ওপরের দিকে হালকা হয়ে যাওয়ার অবস্থান খোলা পরিসরের ইঙ্গিত বহন করছে। যেহেতু এটি সমালোচনাসমৃদ্ধ প্রবন্ধের সংকলন আর সমালোচনা মানেই বিষয়বস্তুর নিহিতার্থ অনুসন্ধান, সেহেতু সেই অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছতা বা খোলা মন। তাই এখানে জমাট নীলের মাঝে সবুজের ক্রমবিন্যাসের মিলন ঘটিয়ে শিল্পী সেই স্বচ্ছতা বা মুক্ত মনের বিমূর্ত উপলব্ধিকে দৃশ্যগত রূপে আকৃতি দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এই মনেরই নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দৃশ্যায়িত কাঠামো দেখা যায় হরেক রঙের তির্যক একগুচ্ছ রেখার সমন্বয়ে অঙ্কিত 'বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা' শব্দ দুটির গূঢ়ার্থে।

যদিও এখানে ৬টি রং দৃশ্যমান, কিন্তু হলুদ ও লাল রঙের ঔজ্জ্বল্য ও আধিক্যে বাকি রং ম্লান-প্রায়। কেননা, হলুদ রং মানবমনের চিন্তা-ভাবনা, যুক্তি-বিচার, তথ্য-তত্ত্ব-এর দৃশ্যগত রূপ আর লাল রংটি চিহ্নায়িত করে আবেগ-অনুভূতিকে। তাই মানব মস্তিস্কের অন্যান্য অনুভূতির রং এখানে প্রকট হয়ে ওঠেনি। সমালোচনাধর্মী এই বইয়ের লেখক যে অনুভূতিকে চিন্তা ও যুক্তির পারস্পরিক বিন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন, তির্যক বর্ণচ্ছটার সাহায্যে শিল্পী সেই অনুভূতিরই বাহ্যিক রূপকল্প গড়েছেন ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতের রঙিন রেখার মাধ্যমে, যা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ইনডেক্স রূপে। যেহেতু বিষয়টি যুক্তি ও সমালোচনার তাই রেখাগুলিকে সরলরেখায় বিন্যস্ত করে সেই ধারণাকেই স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে এবং সাদা তিনকোণাকৃতির আকারগুলি যেন সেই শক্তির মাত্রা নির্দেশ করছে।

সোনাপাখি

ধ্রুব এষ অঙ্কিত মারুফুল ইসলাম রচিত *সোনাপাখি* বইটির প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে শিরোনামের যথার্থ আক্ষরিক অর্থ প্রতীয়মান হয় পাখির আদলে তৈরি অক্ষরগুলোর মধ্যে। এক্ষেত্রে টাইপোগ্রাফির রূপক-এর দুটি অংশই ব্যবহৃত হয়েছে। সোনাপাখি এখানে সরল আকারে হলেও বাস্তবিকই পাখির রূপেই দৃশ্যমান। তাই বলা যায়, অক্ষরগুলি এখানে আইকন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার, পাখিগুলোর বিভিন্ন রকম অবস্থান, ভঙ্গিমা, রং, টেক্সচার ইঙ্গিত বহন করছে এক বা একাধিক ধারণা বা উপলব্ধি। অর্থাৎ তা ইনডেক্স হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

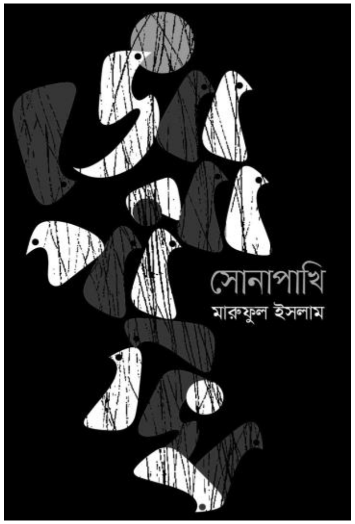

প্রথমত, অক্ষরগুলো একসাথে মিলে প্রকৃতির এক বিমূর্ত রূপের সংকেত তৈরি করেছে। রাতের কালো আকাশে যেন এক ঝাঁক পাখি গাছের বিভিন্ন ডালে বিশ্রামরত। আঁধারে বিলীন হওয়া গাছের এলোমেলো ডালের ছায়া পড়েছে পাখি ও চাঁদের গায়ে। শিরোনাম ও লেখকের নামটি এখানে অদৃশ্য গাছের এক ডাল হিসেবে দৃশ্যমান। পুরো প্রচ্ছদ জুড়ে ফুটে উঠেছে মায়াবী রাতের এক প্রতিচ্ছবি।

দ্বিতীয়ত, প্রচ্ছদের জমিনের কালো রঙের বিপরীতে অক্ষরের লাল-সাদার বৈপরীত্য চিহ্নিত করে শূন্যতা (কালো রং), আলো (সাদা রং) এবং প্রাণ বা অস্তিত্ব (লাল রং)-কে। এই তিন রূপ জীবনকে পরিচালিত করে। ব্যর্থতা-বিষণ্ণতা মানবমনকে ঠেলে দেয়

এক অদ্ভুত শূন্যতায়। আবার, প্রেম-ভালোবাসা-সরলতা মানুষের হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে এ অবর্ণনীয় আবহে। এই সাদা-কালোর মাঝখানে লালের উপস্থিতি যেন জীবনের আলো-আঁধারের মাঝে এক ধরনের আক্রমণ বা বিবাদ। এতে প্রকাশ পায়, বিষাক্ত, কুটিল, জটিল এক মনোভাবের সতর্কবাণী, যা এক লহমায় মানুষের অতি সাধারণ স্তরকে চিহ্নিত করে তোলে। এককথায় বলা যায়, প্রকৃতি ও মানুষের সাদাসিধা জীবনের আলাপন, তাদের অতি পরিচিত মনস্তাত্ত্বিক যে দ্বন্দ্ব তাই পরিস্ফুট হয়েছে আলোচ্য প্রচ্ছদপটে; যা বইয়ের কবিতাগুলোর মূল বিষয়বস্তু।

চলচ্চিত্রপাঠ

২০১৮ সালে প্রকাশিত বেলায়েত হোসেন মামুন সম্পাদিত শিল্পী সব্যসাচী হাজরা অঙ্কিত এই বইয়ের প্রচ্ছদটির ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিরোনাম স্বাভাবিক টেক্সট্ হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে গূঢ়ার্থ হিসেবে এককভাবে প্রচ্ছদের জমিনে এমন এক অবস্থান ও কৌশলে বিন্যস্ত হয়েছে যা সংকেত-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়বস্তু বা ধারণা বা উপলব্ধি তৈরি করে; অর্থাৎ অক্ষর বা চিহ্নায়কগুলো চিহ্নায়িত তথা ধারণার সাথে সাদৃশ্য তৈরি করে রূপকের মাধ্যমে। প্রথমেই বলা যায়, 'চলচ্চিত্রপাঠ' শব্দটি চলচ্চিত্র বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত অনুধাবন সম্পর্কে — এই ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত; কেননা এখানে 'পাঠ' শব্দটিকে জুড়ে দিয়ে লেখক যেমন সেই ধারণাকে কার্যত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তেমনি শিল্পীও এই 'পাঠ' শব্দটি বিবেচনায় রেখে অক্ষরের শৈলী তৈরিতে অতি সূক্ষ্মভাবে অ্যাকাডেমিক ভাবটি বজায় রেখেছেন।

দ্বিতীয়ত, যে কোনো নির্দিষ্ট শৈলীর অক্ষরসমূহ যখন যথাযথ ব্যবধানে পাশাপাশি সজ্জিত হয়, তখন সাধারণত 'মাত্রা' প্রতিটি অক্ষরকে যুক্ত করে নির্দিষ্ট একটি শব্দে পরিণত করে। কিন্তু আলোচ্য প্রচ্ছদে প্রতিটি অক্ষর, যুক্তাক্ষর তার শৈল্পিক শৈলীতে উল- স্বভাবে আলাদা আলাদাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে তার ভাব-গাম্ভীর্য বিন্দুমাত্র খর্ব হয়নি, বরং প্রতিটি অক্ষরের মাত্রার সমান ও ভারিক্কিভাব একটি বিধিসম্মত বা আনুষ্ঠানিক রূপকে চিহ্নিত করে, এতেও এর অ্যাকাডেমিক ভাবটি প্রচ্ছন্নভাবে অনুভূত হয়।

আবার পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু অন্বেষণের ক্ষেত্রে বলা যায়, এক একটি অক্ষর-যুক্তাক্ষর ক্যামেরায় ধারণকৃত গতিশীল ছোটো ছোটো খণ্ডচিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেখানে প্রতিটি খণ্ডচিত্র একসাথে কোনো বিষয়, ঘটনা বা কাহিনিকে দৃশ্যায়িত করছে তথা পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর ধারণা প্রদান করছে।

কালো রং এখানে অন্ধকারের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; যাতে অক্ষরগুলোকে আলোকিত করে তোলার জন্য এই রঙের দীর্ঘ বিস্তৃতি অক্ষরের ছায়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা আসলে চলচ্চিত্রের আরেক নাম 'ছায়াচিত্র' বা 'ছায়াছবি'র রূপক হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। ছায়ার এই কোণ এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে, যা ক্যামেরা থেকে আসা আলোর এক নির্দিষ্ট ফোকাস বা প্রক্ষেপণ রশ্মি রূপে প্রতীয়মান হয়; যেখানে সাদৃশ্য পাওয়া যায় ক্যামেরা, লাইট-এর মাধ্যমে চলচ্চিত্রের কোনো বিষয়, বস্তু, স্থান বা ধারণার ফোকাসের সাথে।

লাল অন্যতম প্রধান রং হিসেবে এখানে সকল রংকে উন্মোচিত করছে। এই চিহ্ন এখানে জীবনের নানান রঙের প্রতীক — অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি বাঁকের নানান ঘটনাপ্রবাহের প্রচ্ছন্ন ধারণা দেওয়া হয়েছে, যা চলচ্চিত্রের প্রধান অবলম্বন হিসেবে স্বীকৃত। অন্যদিকে লাল রং রক্তকেও চিহ্নিত করে, যেখানে এক বিন্দু রক্ত থেকে গোটা মানুষের সৃষ্টির যে ধারণা বিদ্যমান, সেখানে বলা যায়, প্রচ্ছদটির অধিকাংশ জমিন সেই বিন্দুরই পুঞ্জীভূত অবস্থান সৃষ্টিশীলতার এক অস্পষ্ট ধারণা দেয়। আর চলচ্চিত্র মানেই সৃষ্টিশীলতার এক ব্যপক ক্ষেত্র, যেখানে আস্বাদন করা যায় সকল শিল্পের রসানুভূতি।

প্রচ্ছদশিল্পী একই সাথে পাঠক ও শিল্পী। কিন্তু তাকে পাঠকসত্তার চেয়ে শিল্পীসত্তাকে ধারণ করতে হয় অনেক অনেক বেশি। কেননা, রচনার ভাবার্থ বা সারাংশ উপলব্ধিতে পাঠকের অনুভূতি কেবল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আকারেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, কিন্তু প্রচ্ছদশিল্পী অনুভূতিকে রূপকল্পে দৃশ্যায়িত করেন। এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব গভীর আত্মোপলব্ধি ও জীবনবোধই সেই রূপকল্পের রূপরেখা নির্ধারণ করে। অন্যান্য প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে এই রূপকল্প তৈরি যতটা সহজ টাইপোগ্রাফিক প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে ততটা সহজ নয়। শিরোনামের ওপর নির্ভর করেই শিল্পী তাঁর মনন ও অনুভূতিকে বাহ্যিকরূপে আকার দেন এ ধরনের প্রচ্ছদে। এ ক্ষেত্রে শিল্পীর প্রধান কুশলতা — নির্বাচন। কারণ, রচনার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করে যথাযথ গূঢ়ার্থ তৈরির জন্য শিল্পীকে অক্ষরের শৈলী নির্বাচন করতে হয়, অক্ষরকে শুধু অভিনব ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলবে তা নয়, বরং সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকতে হবে নির্দিষ্ট ভাব-ধারণার সংকেত ও প্রতীক।

আলোচ্য প্রচ্ছদগুলিতে তিন ধরনের অক্ষরশৈলীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন–

১. *রক্তাক্ত বাংলা* এবং *চলচ্চিত্রপাঠ* বই দুটির প্রচ্ছদে শিরোনাম নিজেই গূঢ়ার্থ রূপে বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে শিরোনাম হিসেবে অক্ষরগুলি যেমন সহজ ও স্পষ্ট, তেমনি গূঢ়ার্থ হিসেবে ইঙ্গিত বহন করে নির্দিষ্ট বক্তব্যের অন্তর্শায়িত অর্থপুঞ্জ। অর্থাৎ এখানে

শিরোনাম দ্বৈত ভূমিকা বহন করছে। দুটি প্রচ্ছদের ক্ষেত্রেই শিরোনাম এতটাই স্পষ্ট শব্দে উচ্চারিত হয়েছে, যেখানে বইয়ের মূল রচনার ভাব প্রকাশে কোনো অস্পষ্টতা প্রকাশ পায়নি। তবে, সেই বক্তব্যের বলিষ্ঠতা তৈরিতে শিল্পীর নিপুণতা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। যেমন — শিল্পী 'রক্তাক্ত' শব্দটিতে সরু ও মোটা দুটি ভিন্ন পুরুত্বের রেখা ব্যবহার করেছেন, ফলে শব্দটিতে অস্ত্র-শস্ত্রে দুর্বল কিন্তু জোরালো মনোবলের বাঙালি জাতির একটি অবভাস তৈরি হয়েছে। আবার, একই মোটা পুরুত্বের রেখা দিয়ে 'বাংলা' শব্দটিকে বেশি শক্তিশালী ও সাহসী করে সূচিত করেছেন;যাতে শরীরকে রক্তে রাঙিয়ে,ব্যথায় কাতর হয়েও'বাংলা'শব্দটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন দুঃসাহসিক অবস্থানকে প্রকাশ করেছে।

চলচ্চিত্রপাঠ শিরোনামের ক্ষেত্রে শিল্পী মূল রচনার পাঠ্যসূচিকেই যেন সূক্ষ্ম কৌশলে দৃশ্যগত আকারে রূপ দিয়েছেন। পাঠ্যসূচিতে যেমন মূল বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তরূপ এক নজরে পাওয়া যায়, তেমনি সজ্জিত হয়েছে এই প্রচ্ছদের শিরোনামের প্রতিটি অক্ষর; যাতে প্রতিটি অক্ষরই আলাদা আলাদাভাবে বলিষ্ঠ এবং মার্জিত এবং আপন আলোয় উদ্ভাসিত। একক অক্ষর হওয়া সত্ত্বেও সবগুলি মাত্রার প্রস্থ সমান হওয়ায় প্রত্যেকটি অক্ষর সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা পেয়েছে। এখানে এক একটি অক্ষর প্রতিনিধিত্ব করে দুই বাংলার সেই সব বরেণ্য মানুষদের, যাদের চলচ্চিত্র নিয়ে বিভিন্ন সময়ের কথোপকথন আলোচ্য বইয়ের মূল বিষয়বস্তু।

২. *রৌদ্র করোটিতে, জীবন আমার বোন, বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা* — প্রচ্ছদগুলির ধরন আবার ভিন্ন। মূল শিরোনামের আক্ষরিক বিন্যাস ছাড়াও উক্ত অক্ষরের গূঢ়ার্থের বাহ্যিক বিন্যাস উপস্থাপিত হয়েছে নান্দনিক ও বিশিষ্ট শৈল্পিকতায়; যেখানে এসেছে প্রকৃতির নানান সরল উপাদান, টেক্সচার, আকার-আকৃতি, রেখা, বহুবিধ রঙের ব্যঞ্জনা ইত্যাদি। *রৌদ্র করোটিতে*-র প্রচ্ছদের চিহ্নগুলিতে শিল্পী যদিও বইয়ের কবিতাগুলির সামগ্রিক ধারণার জন্য কবিতাসুলভ চিহ্নেরই অবতারণা করেছেন বিভিন্ন উপাদান ও তার বিন্যাসে, তারপরও বইয়ে অবস্থিত 'রৌদ্র করোটিতে' নামের একটি একক কবিতার লুকানো চিহ্ন যেন এখানে উঠে এসেছে। ৫০-এর দশকে শামসুর রাহমান রচিত এই কবিতাটি অনেকাংশেই বাংলার পরাধীনতাকে ধিক্কার জানিয়ে লেখা হয়েছে, যেখানে পংক্তির পরতে পরতে অলংকৃত হয়েছে শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষকে জেগে তোলার মন্ত্র। সেই মন্ত্রের বীজ গ্রোথিত হয়েছে প্রচ্ছদে চিত্রিত অক্ষর দিয়ে তৈরি লতানো গাছের আকৃতিতে। অক্ষরগুলি একদিকে যেমন পুরোটা মিলে একটি গাছের আকৃতি পেয়েছে, অন্যদিকে এক একটি সাদা অক্ষর আবার সরু সরু রেখা আবৃত বিভিন্ন প্রজাতির গাছের পাতা হিসেবে একসাথে জড়ো হয়েছে। পাতার সাদা রং এখানে সূর্যের আলো এবং নীল সরু রেখা শিরা-উপশিরার ধারণা দেয়। পাতা যেমন সূর্যালোক গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে পুরো গাছকে বেঁচে থাকার শক্তি যোগায়, তদুপরি মানুষের বাঁচার জন্য তৈরি করে অক্সিজেন, তেমনি প্রচ্ছদটিতে

শিল্পীযেন অনেক জাতের পাতার মিলন ঘটিয়ে অফুরন্ত শক্তি ও অক্সিজেন ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, নানা গোত্র-বর্ণের মানুষের একতাবদ্ধ হয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার কবির সেই সুপ্ত বাসনাকে পুরোপুরি রূপকের সাহায্যে পরিস্ফুট করেছে।

জীবন আমার বোন উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিককালের সংকটময় রাজনৈতিক পরিবেশ, কিন্তু প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে সরাসরি তার কোনো প্রভাব পাওয়া যায় না। তবে চাপা উত্তেজনা আর অস্থিরতার যে আভাস পাওয়া যায় তার দৃশ্যায়িত রূপ দেখা যায় অক্ষরের গূঢ়ার্থের কালো রং আর সরু রেখার আঁচড়ে। বিস্তৃত ম্যাজেন্টা রঙের বিপরীতে কালো রঙের অক্ষরগুলির রুদ্ধ আকার উপন্যাসে নানা নারীর মাঝে নায়কের একক ভূমিকার কথা স্পষ্ট করে তুলেছে। তার সার্বক্ষণিক নিজেকে গুটিয়ে রাখার যে প্রবণতা উপন্যাসে দেখা যায় তার দৃশ্যগত আকার চিত্রিত হয়েছে প্রচ্ছদের অক্ষরগুলির গূঢ়ার্থে। তাই অক্ষরগুলি আবদ্ধ, একটার গায়ে একটা প্রায় লাগানো,যেন কোনো কিছুর চাপে সেগুলি ভীত, আবদ্ধ, সন্নিবদ্ধ, নিমজ্জিত, ভারাক্রান্ত। প্রচ্ছদের জমিন ও অন্যান্য চিহ্নের মাঝে অক্ষরগুলি যেন বেমানান, যেমন বেমানান উপন্যাসের অস্থির পটভূমিতে চিন্তা ও মানসিকতায় নায়কের বিপরীতধর্মী আচরণ। অর্থাৎ বিভিন্ন আকার-আকৃতি ও টেক্সচারের মাধ্যমে আলোচ্য প্রচ্ছদটির রূপক বিন্যস্ত হয়েছে।

যদিও উপরিউক্ত প্রচ্ছদ দুটিতে একটি বা দুটি মাত্র রঙের চিহ্নায়ক দিয়ে অনেক সংকেত ও প্রতীক ব্যাখা করা হয়েছে, কিন্তু 'বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা' প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে রংধনুর বর্ণচ্ছটার মাধ্যমে শিল্পী বইয়ের মূল বিষয়-বস্তুর বিচিত্রতা তুলে ধরেছেন। তবে এখানে রংধনুর সব রং ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়, এমনকি অনুপাতেও রয়েছে ভিন্নতা, যা আপাতদৃষ্টিতে বর্ণালির ছন্দপতন হলেও তা রচনার বিচিত্র বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, আলোচ্য রচনা কোনো একক বিষয় নিয়ে নয়, বরং বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা-সমালোচনা-পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। ফলে সমালোচককে যেমন বিভিন্ন সমালোচনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তথ্য-তত্ত্ব, যুক্তি-প্রতিযুক্তি সাজাতে হয়েছে, তেমনি শিল্পীও সূক্ষ্ম কৌশলে একই আঙ্গিকের মধ্যে ছন্দপতন ঘটিয়ে সরল রঙিন রেখায় সেই যুক্তি-তর্ককে চাক্ষুষ রূপ দিয়েছেন।

৩. *সোনাপাখি* বইটির প্রচ্ছদে টেক্সট হিসেবে শিরোনামের নির্দিষ্ট অবস্থান ছাড়াও উক্ত শিরোনামের আক্ষরিক অর্থের বাহ্যিক রূপ ফুটে উঠেছে অক্ষরগুলোর 'পাখি'র আদলে বিন্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে, আবার 'সোনাপাখি' শিরোনাম বাস্তবিকই সোনালি রঙে আঁকা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে অক্ষরের গূঢ়ার্থ এবং শিরোনাম উভয় ক্ষেত্রেই রূপকের আইকন অংশ ব্যবহৃত হয়েছে।

অনেক সময়ই টাইপোগ্রাফিক প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে শিরোনামের আক্ষরিক অর্থ এবং সৃষ্ট গূঢ়ার্থ দিয়ে সেই অর্থকে হুবহু চিত্রায়িত করতে অনেক সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়

শিল্পীকে। ফলে এ ধরনের প্রচ্ছদের আইকন তৈরি তেমন একটা দেখা যায় না। ইনডেক্স ও সিম্বল-ই এ সকল প্রচ্ছদের মূল চালিকাশক্তি। ঠিক একই কারণে একজন প্রচ্ছদশিল্পী শুধু লেখানির্ভর প্রচ্ছদ তৈরিতে দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারেন না। এর কারণ হয়ত এই যে, রকমারি রচনার ক্ষেত্রে শুধু অক্ষরকে ভিত্তি করে রূপকল্প তৈরি করা অনেক সময়েই যথেষ্ট হয় না। তাছাড়া শিল্পী তাঁর নিজের শিল্পীসত্তার বহুমাত্রিক জাগরণ ঘটানোরও একটি প্রচ্ছন্ন বাসনা পোষণ করে থাকেন।

উপসংহার

প্রচ্ছদ পাঠকের গ্রন্থবিষয়ক প্রথম অনুভবের প্রকাশতল যা প্রচ্ছদের চিহ্নিত ভাষা শনাক্ত করার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পাঠকের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই ভাষা অনুধাবন করার চেষ্টা মানে রুচির চর্চা, রুচির উন্নয়ন ও রুচির প্রসারণ। আর সেই ভাষা যদি হয় টাইপোগ্রাফিক, যা বিন্যস্ত হয় শিল্পীর অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাধীন ক্রিয়ায় তা আপাতদৃষ্টিতে অনির্ণেয় হলেও বাংলা ভাষার মূল চিহ্নায়ক। এই টাইপোগ্রাফিক চর্চা বৃদ্ধি পেলে বাংলা হরফ প্রচ্ছদে প্রভাব বিস্তার করে উপস্থাপিত হবে আরও নান্দনিক ও শৈল্পিকভাবে, সমাদৃত হবে আরো স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে — এটাই প্রত্যাশিত।

টীকা

১. গুটেনবার্গ : আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র ও বিচল হরফ পদ্ধতির সফল ব্যবহারকারী। পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে জার্মানিতে জোহান গুটেনবার্গ (১৩৯৮-১৪৬৮) যখন তাঁর উদ্ভাবিত মুদ্রণযন্ত্রের জন্য ধাতব হরফ তৈরি করেন তখন থেকেই মূলত আধুনিক টাইপোগ্রাফির ইতিহাস শুরু হয়। (Johann Gutenberg. Encyclopedia of World Biography. https://www.encyclopedia.com/people/literature-and-arts/libraries-books-and-printing-biographies/johann-gutenberg#1G23404702709

২. বিচল হরফ: হরফ মুদ্রণের একটি প্রযুক্তিগত পদ্ধতি, যা ধাতবে পৃথক পৃথকভাবে তৈরি করে হাতে সাজিয়ে কাগজে ছাপানোর জন্য উপযোগী ছিল। ইচ্ছেমতো নড়াচড়া করানো যেত বলে এর নামকরণ করা হয় 'বিচল হরফ' (moveable type)। ১০৪১ থেকে ১০৪৮ সালের মধ্যে একজন চাইনিজ অ্যালকেমিস্ট Bi Sheng (990-1051 AD) চাইনিজ পোর্সিলিন দিয়ে প্রথম 'বিচল' হরফ বা moveable type তৈরি করেন। (The Invention of Movable Type in China. http://www.historyofinformation.com/index.php)। পনেরো শতকে জার্মানিতে জোহান গুটেনবার্গ তাঁর উদ্ভাবিত মুদ্রণযন্ত্রের জন্য প্রথম এই হরফ ব্যবহার করে সফল হন।

৩. বাংলা বিচল হরফ: হুগলীর খুশমত মুনশী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক কালীকুমার রায়ের হাতের লেখাকে অনুসরণ করে ১৭৭৮ সালে ইংরেজ পাদ্রী চার্লস উইলকিনস্ এবং তাঁর বাঙাফল সহকর্মী পঞ্চানন কর্মকার প্রথম বাংলা বিচল হরফ নির্মাণ করেন। প্রতিটি হরফ ছেনিতে কেটে ছাঁচ তৈরি করে সেই ছাঁচে ঢালাই করে এই হরফ বানানো হয়েছিল; যা ইচ্ছেমতো নাড়াচাড়া করা যায়।'বিচল' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা 'বিচল' হরফের সেটাই প্রথম ব্যবহার। (অশোক, ২০১৩ : ১৫)

৪. *A Grammar of the Bengal Language* : ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড (১৭৫১-১৮৩০)-এর লেখা একটি বই। এটি ১৭৭৮ সালে হুগলিতে ছাপা হয়। বইটি ইংরেজিতে লেখা হলেও এতে প্রথম বাংলা ছাপা অক্ষরের (বিচল হরফ) নমুনা পাওয়া যায়। বাংলা পুথির মতো আড়াআড়ি ভাবে নয়, এটি ছাপা হয়েছে পশ্চিমী ঢঙে, খাড়াভাবে। বইটির পাতার মাপ ছাপাখানার ভাষায় ক্রাউন কোয়ার্টো, অর্থাৎ ১০ × ৭১/২ ইঞ্চি। বইটির মুদ্রিত এলাকার আয়তন সাধারণত ৬৩/৪X ৪৩/৪ ইঞ্চি। চারপাশে বেশ সাদা অংশ ছাড়া হয়েছে। ইংরেজিতে এ ধরনের ছাপাকে বলা হয় 'ডিল্যুক্স' এবং বাংলায় — শোভন সংস্করণ। বইটিতে পাশের 'আকার' এবং মাঝের 'আকার' আলাদাভাবে তৈরি করে ব্যবহার করা হয়েছে এবং আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছে ধারের 'এ'কার ও শব্দের মধ্যবর্তী 'এ' কার। (অশোক, ২০১৩ : ১৫, ১৯, ২৩)

৫. বটতলার বই : উত্তর কলকাতার শোভাবাজার বালাখানা অঞ্চলে 'বান্ধা বটতলা' নামে পরিচিত একটি বটবৃক্ষ ও সেই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা বইয়ের ব্যবসা গড়ে উঠেছিল। উত্তর ও মধ্য কলকাতার বাঙালি স্বত্বাধিকারীদের বটতলার এই ছাপাখানাগুলোতে সস্তা কাগজে পুরোনো হরফে বই ছাপিয়ে বেশ সস্তা দামে বিক্রি করা হতো। বটতলায় প্রথম ছাপাখানা শুরু করেন বিশ্বনাথ দেব। এখানে বইয়ের পসরার সঙ্গে সঙ্গে পুরবাসীদের বিশ্রাম নেওয়া, আড্ডা দেওয়া, গান-বাজনা ইত্যাদি অন্যান্য কাজও চলত। তখন বাংলা বইয়ের মুদ্রাকর, প্রকাশক ও বিক্রেতা ছিলেন তিনে মিলে এক। Chapman বা ফেরিওয়ালা বিক্রি করত বলে বটতলার বইকে অনেক সময় Chap-Book বলা হতো। ১৮৪০ থেকে ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বটতলা ছাপাখানার স্বর্ণযুগ ছিল। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের পরে প্রকাশকদের ঠিকানা থেকে বটতলা নামটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। (সুকুমার, ২০১৫ : ১৩-১৪, ৫৫)

৬. বাউহাউস: জার্মান আর্ট স্কুল, যা ১৯১৯ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। [Oxford Dictionary of Art and Artists (Oxford : Oxford University Press, 4th edn., 2009), ISBN 0-19-953294-X,)] 'বাউহাউস' শব্দটি জার্মান শব্দ, যার শাব্দিক অর্থ 'নির্মাণ ঘর'। স্কুলটি ছিল আর্ট এবং কারুশিল্পের সম্মিলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা নির্মিত হয়েছিল আর্ট-এর সকল ক্ষেত্র নির্মাণের ধারণা থেকে, এমনকি স্থাপত্যবিদ্যাও। এই স্কুলটি পরে আধুনিক শিল্প, স্থাপত্য, গ্রাফিক ডিজাইন, ইনটেরিয়র ডিজাইন, ইনডাসট্রিয়াল ডিজাইন এবং টাইপোগ্রাফি শিক্ষার সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। (Bauhaus Movement. Rethinking the world Art and Technology — A new Unity. http://www.bauhaus-movement.com/en/)

৭. বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ : বাংলা বইয়ের প্রকাশনা জগতে একটি বড় জায়গা দখল করে আছে এই বিভাগ। প্রথম পর্বে এই প্রকাশনা বিভাগের নাম ছিল 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়', পরবর্তীকালে এটি বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ নামে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্র রচনা প্রকাশই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। অনেকের মতে ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের সূচনা হয়। সাধারণত মলাটে হালকা গেরুয়া রঙের ওপর রবীন্দ্রনাথের লেখায় প্রচ্ছদ ছিল এই বিভাগের বইয়ের একটি নিজস্ব টিপছাপ– যা আজও দেখা যায়। (সুশোভন, ২০১৩ : ৬৬-৬৭)। পাঠ্য-বস্তু হিসেবে বই-পত্র-পত্রিকা-পুস্তিকার প্রাথমিক আকর্ষণ যে বইয়ের আকার, আকৃতি, প্রচ্ছদ, বাঁধাই, হরফের চেহারা, আয়তন, বিন্যাস, পংক্তি বিন্যাস, পৃষ্ঠা বিন্যাস, চিত্রালংকার বিন্যাস ইত্যাদি পুলিনবিহারী সেনের পরিচালনায় বাংলা প্রকাশনায় সচেতন ভাবে প্রথম প্রয়োগ করে এই বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। (প্রণবরঞ্জন, ২০১৭ক : ৮)

৮. ক্যালিগ্রাফি: সাধারণত গতানুগতিক ছাপার অক্ষর ছাড়া কোনো লেখা বা সুন্দর হাতের লেখাকে ক্যালিগ্রাফি বলা হয়ে থাকে। লেখার এই শিল্পটি বহু প্রাচীন। মানুষ যখন থেকে লিখতে শুরু করেছে, বলা যায় ক্যালিগ্রাফির সূচনা তখন থেকেই। আভিধানিক তথ্য অনুযায়ী, ক্যালিগ্রাফি শব্দের উৎপত্তি গ্রিক শব্দ 'Kalla'– যার অর্থ 'beautiful'/সুন্দর এবং 'Grafia' যার অর্থ 'writing'/ লেখা। অর্থাৎ সুন্দর লেখা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু সুন্দর লেখা ছাড়াও আরও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আদব-কায়দা, পদ্ধতি যুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে আজকের ক্যালিগ্রাফি। (সোমনাথ, ২০১৩ : ৪৫-৪৬)

গ্রন্থপঞ্জি

অশোক উপাধ্যায়, (২০১৩)। *বাংলা মুদ্রণশিল্পের সূচনাপর্ব*, ১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা, ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা চার্বাক। অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা।

প্রণবরঞ্জনরায়, (২০১৭)। *বাংলা বই-য়ের প্রচ্ছদ, চমৎকার*, প্রথম সংখ্যা, ঋকাল বুকস্, কলকাতা।

প্রণবরঞ্জন রায়, (২০১৭খ)। 'প্রচ্ছদ শিল্পের কবি পূর্ণেন্দু পত্রী', *চমৎকার*, প্রথম সংখ্যা, ঋকাল বুকস্, কলকাতা।

প্রণবেশ মাইতি, (২০১৭)। *'প্রচ্ছদভাবনা', চমৎকার*, প্রথম সংখ্যা, ঋকাল বুকস্, কলকাতা।

মামুন কায়সার, (২০০৭)। *বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শাহ্‌রিয়ার রহমান, সৈয়দ (২০০৮)। *উপমা-চিত্রকলা ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সুকুমার সেন, (২০১৫)। *বটতলার ছাপা ও ছবি* (৪র্থ সংস্করণ), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সুশোভন অধিকারী, (২০১৩)। 'বিশ্বভারতীর বই', *১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা*, ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, চার্বাক, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা।

সোমনাথ ঘোষ, (২০১৩)। 'শিল্পিত বর্ণমালা', *১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা*, ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, চার্বাক, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা।

Caivano, Jose Luis, (1998). 'Color and semiotics : A two-way street', Article in Color Research & Application, University of Buenos Aires.

Charler, B., Albert, S., Albert, R. (ed) (1966). *Ferdinand de Saussure : Course in General Linguistics*, Translated by Wade, B. McGraw-Hill book company, New York.

Cmeciu, D, (1987). *Book Covers-Diachronic Signs of Intertexulity*, Penguin Books, USA.

Finkelstein, D., McCleery, A. (2005/2007). *An Introduction to Book History*, Routledge, New York and London.

Genette, G. (1997). *Paratexts: Thresholds of Interpretation*, trans: by Jane E. Lewin. Cambridge University Press.

Halliday, M. A. K. (1978). *Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning*, London: Edward Arnold.

John Siebert, (2015). 'The Evolution of Typography: A Brief History'. http://www.printmag.com/typography/evolution-typography-history/

Justus, B. (ed.) (1955). 'The Philosophical Writings of Peirce', Dover Publications, New York.

Machin, D. (2007). *Introduction to multimodal analysis*, London: Hodder Arnold.

Saller, C. (2012). 'Typographic Book Covers',Lingua Franca Blogs. The Chronicle of Higher Education.https://www.chronicle.com/blogs/linguafranca/ 2012/06/ 13/typographic-book-covers/

Smirna, K. (2017). 'The History of Typography and its Journey : Through Art'

(https://www.widewalls.ch/author/smirna_kulenovic/)

Sebeok T. (1976). *Contributions to the Doctrine of Signs*, Indiana University Press, Bloomington.

Van leeuwen, T. (2005a). *Introducing Social Semiotics*, Routledge, London & New York.

— (2005b). 'Typographic meaning, Visual Communication', vol. 4, No. 2.

— (2006). 'Towards a semiotics of typography,' Information Design Journal, 14(2).

অভিসন্দর্ভ

মাকসুদুর রহমান (১৯৯৫), 'টাইপোগ্রাফি', এম.এফ.এ. অভিসন্দর্ভ, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অন্য উৎস

'Bauhaus Movement.Rethinking the world Art and Technology – A new Unity.'

http://www.bauhaus-movement.com/en/

Holden, Martha. (2007). 'The Many Meanings of Color. Developed as part of Complementary'. http"//www.clevelandart.org/sites/default/files/cma_lesson_ nhj_meaningcolor.pdf

https://www.bourncreative.com/meaning-of-the-color

Jackson, Amy. 'History of Color Theory'. Study.com

Jefferson Robinson, (2017). 'Colour Semiotics and what they mean in other cultures'.Buzzword.http://www.buzzwordcreative.co.uk/blog/colour-semiotics-and-what-they-mean-in-other-cultures/

Johann Gutenberg. *Encyclopedia of World Biography*. https://www.encyclopedia. com/people/literature-and-arts/libraries-books-and-printing-biographies/johann -gutenberg#1G23404702709

'Newton & the Colour spectrum'. http://www.webexhibits.org/colorart/bh.html)|

'The Invention of Movable Type in China'. http://www.historyofinformation. com/index.php

www.color-wheel-pro.com/color-meaning.html